উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ

সরদার আবদুর রহমান

www.nagorikpathagar.com

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ

সরদার আবদুর রহমান

Ecological Environment of
North – West Region

By Sardar Abdur Rahman

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৬

প্রকাশক
পরিলেখ প্রকাশনী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ড. এম. আসাদ উজ জামান

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

মুদ্রণ
পদ্মা অফসেট প্রিন্টার্স
মালোপাড়া (সাবেক বৃটিশ কাউন্সিলের গলি),
রাজশাহী। ফোন: ৭৭০৩০৮

অক্ষর বিন্যাস
আসাদুজ্জামান আসাদ
তোফাজ্জল হোসেন চাঁদ

প্রচ্ছদ কনসেপ্ট
গালিব সর্দার

অঙ্গসজ্জা
মু ইয়াহিয়া সেলিম

পরিবেশক
পরিলেখ প্রকাশনী
ঐশিক, আবদুল হক সড়ক
রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

মূল্য : ১০০ টাকা
Price: 100 Taka.

www.nagorikpathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে সাম্প্রতিককালে সর্বত্রই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানুষের এই ভূমি, এই পানি, এই বাতাস তথা সার্বিক প্রাকৃতিক অবস্থা কতটা অনুকূল থাকতে পারছে, আর কতটা বিপর্যস্ত হচ্ছে-তা নিয়ে গবেষণা- আলোচনার অন্ত নেই।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ নামক ভূ -খন্ডও এই পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলের ভূমি, কৃষি, বন, বন্যপ্রাণী, জনস্বাস্থ্য, নদী ও প্রকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে এক অনাকাঙ্খিত পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন

প্রকল্প, কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্ষতিকর দিককে গুরুত্ব না দেয়া, আপতঃ লাভালাভকে প্রাধান্য দেয়া, সূদুরপ্রসারী ক্ষয়ক্ষতিকে বিবেচনায় না আনা এবং সামগ্রিকভাবে সমন্বয়ের অভাব এই অবস্থাকে ভয়াবহ করে তুলেছে।

উত্তরাঞ্চলের পরিবেশগত পরিস্থিতির নানা রূপ ও বৈচিত্র্য লক্ষ্যনীয়। যা প্রধানতঃ মানবসৃষ্ট। বলাবাহুল্য, পদ্মানদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ ও তিস্তাসহ বিভিন্ন নদীকে বাঁধ দিয়ে প্রবাহহীন করে দেয়া, বন উজাড় করা, ভূমি ও জলাশয়কে রাসায়নিক ও কীটনাশক দিয়ে বিষাক্ত করে তোলা প্রভৃতি বিষয় খুবই গুরুত্বপুর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ।

অত্র গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয় সমূহের একটি চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এটি কোন গবেষণা গ্রন্থ নয়। একজন সংবাদকর্মীর পর্যবেক্ষণ, সংগৃহীত তথ্য ও সরেজমিনে পরিস্থিতির শিকার মানুষদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন মাত্র। এই গ্রন্থ পরিবেশ বিষয়ে কার্যরত কর্মীদের কিছু কাজে লাগলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

এই গ্রন্থ প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও সহযোগিতাকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাজশাহী
১ জানুয়ারী ২০০৬

সরদার আবদুর রহমান

www.nagorikpathagar.com

প্রকাশকের কথা

প্রকৃতি আপন হাতে যদি কোন দেশকে তার সমৃদ্ধ ভান্ডার থেকে কোন দান দিয়ে থাকে তবে তা পেয়েছে বাংলাদেশ। এর সমস্ত ভূমিই উর্বর এবং মিঠা পানির নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-জলাশয়ে পরিপূর্ণ। কিছু অংশ বাদে সমস্ত ভূ-ভাগই সমতল। এই সমভূমি এতটাই উর্বর যে চাষিরা অনায়াসেই ফসল ফলাতে পারে। পাহাড়গুলোও অনাবাদি নয়; জুম পদ্ধতির চাষে সেখানেও উৎপাদন হয় বিভিন্ন ফসল এবং অন্যতম অর্থকরী ফসল চা। তাই সবুজ বাংলাদেশকে সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

উর্বর ভূমি বাংলাদেশে জনসংখ্যার আধিক্যের একটি কারণ। বর্তমানে আয়তনের তুলনায় সবচেয়ে জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় সাড়ে নয়শ জন লোক বসবাস করছে। কিন্তু যে ঐশ্বর্যশালী প্রকৃতির কারণে মনুষ্য আধিক্যের সৃষ্টি হয়েছে, সে মানুষই আজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক এখন শত্রুভাবাপন্ন। পূর্ব নিয়মের চাষাবাদে মানুষ জমি থেকে প্রয়োজনীয় খোরাক উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারছেন না। ফলে ব্যবহার করছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক। নতুন পদ্ধতির মাছ চাষে পুকুর-জলাশয়ে ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। পাহাড় ও জঙ্গল কাটা হচ্ছে। পাশাপাশি পলিথিন, কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থ, মোটর গাড়ির কালো ধোঁয়া প্রভৃতি প্রতিনিয়তই পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। নদ-নদীগুলোর নাব্যতা ক্রমশ কমে যাওয়ায় আমাদের পরিবেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে। এদেশের নদ-নদীগুলো সবই বঙ্গোপসাগরমুখি এবং প্রায় সবগুলোর উৎস মুখ ভারতে। ভারত সরকার ফারাক্কা ব্যারেজসহ অন্যান্য নদীতে বাঁধ দেয়ার ফলে নদ-নদীগুলো বর্ষা মৌসুম ছাড়া অন্যান্য সময় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ধক্ ধক্ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নীতকরণের জন্য বিভিন্ন নদীতে সেতু তৈরীর কারণে নদীগুলোর বুকে ধু ধু বালির চর পড়তে শুরু করেছে। যমুনা বহুমুখি সেতুই তার বড় প্রমাণ।

এই চলমান অবনতির প্রতিকার না করতে পারলে আগামীতে পরিবেশ বিপর্যয় যে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছাবে তা বলা মুশকিল। ইতোমধ্যে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা গ্রীন হাউজ এফেক্টের পূর্বাভাস দিয়েছেন। এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেশের দক্ষিণের কিছু অংশ সাগরে তলিয়ে যাবার কথাও বলা হয়েছে। গ্রীন হাউজ এফেক্টের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর মত আমরা দায়ী না হলেও আমাদের অভ্যন্তরে যা কিছু ঘটছে তার জন্য সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায়

www.nagorikpathagar.com

আগামী প্রজন্মকে মারাত্মক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সরদার আব্দুর রহমান এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করেই 'উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ" বইটি লিখেছেন। তিনি পরিবেশ সাংবাদিকতায় জাতীয় পুরস্কার ১৯৯৯ লাভ করেন। লেখক উত্তরাঞ্চলের মানুষ। তিনি উত্তরাঞ্চলের মাটিতে জন্ম গ্রহণ করে শৈশব-কিশোর অতিক্রম করে বর্তমানে পৌঁছে অনেক কিছুই দেখার সুযোগ পেয়েছেন। যাতে তার পাণ্ডুলিপি বর্ণনায় সহজ হয়েছে। যে সব কারণে উত্তরাঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে তার বিভিন্ন দিক তিনি এই বইটিতে আলোচনা করেছেন। এই মহৎ কর্মটি সবার নিকট উপস্থাপন করার তাগিদেই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আশাকরি বইটি উত্তরাঞ্চল পরিস্থিতির সচিত্র প্রতিবেদন রূপেই দেশের পরিবেশ সচেতন মানুষ ও পাঠকবৃন্দর নিকট উপস্থাপন করতে পারবে।

www.nagorikpathagar.com

অভিমত

পরিবেশ বিষয়ক উদ্দীপক রচনা "উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ।" এই বইয়ের প্রতিবেদনগুলোতে উত্তরাঞ্চলের পরিবেশের নানা সঙ্কটের কথা বলা হয়েছে। বইটিতে পরিবেশিত নানা তথ্য ও উপস্থাপনা কৌশল পরিবেশবিদদের নানা জিজ্ঞাসা ও গবেষণা ও গবেষণার দিক নির্দেশ করবে বলে আমার বিশ্বাস। পরিবেশ বিষয়ে পড়ুয়াদের এবং গবেষকদের আগ্রহী করে তুলবে। প্রতিবেদনগুলোকে উদ্দীপক রচনা সম্ভার বলা যেতে পারে। উত্তরাঞ্চল এক সময়ে জীববৈচিত্র্যের সম্ভার ছিল, আজ বন ও বন্যপাণী উজাড় হয়ে গেছে। ফুড চেইন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। উত্তরাঞ্চলের ছোট মাছ আজ সোনার মত দামী। ফারাক্কার প্রতিক্রিয়ায় পদ্মা চরাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এ-অঞ্চলের মাটি পানি ক্যান্সারে আক্রান্ত। বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর নিম্নগামী হওয়ায় চাষাবাদে হাহাকার। আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড রোগে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধি। কুষ্ঠ ও ফাইলেরিয়াসিসের রোগীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র উত্তরাঞ্চলেই ৬ লাখ লোক আর্সেনিকে আক্রান্ত। নদীভাঙ্গনে কয়েক লাখ লোক গৃহহীন। এভাবে উত্তরাঞ্চলের বিপন্ন পরিবেশের নানা তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে সরদার আবদুর রহমান রচিত এই গ্রন্থটিতে। পরিবেশ সংরক্ষণের নানা ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে বইটিতে। কর্মঅভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পারি যে, আগামী দিনের প্রজন্মকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবার জন্য বইটি একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। জনাব রহমানের এই প্রতিবেদন গ্রন্থটি একটি অনুসন্ধানী বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক প্রতিবেদন। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় ও তথ্যের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ এমন দাবী করা ঠিক হবে না। এটি কোনক্রমেই তত্ত্বপুস্তক নয়। তবে নিঃসন্দেহে তথ্যে সমৃদ্ধ। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা ও গণজাগরণ গড়ে তুলবার ইচ্ছেই এখানে বড় বিবেচনা পেয়েছে এবং এ-কারণেই গ্রন্থটি একটি উদ্দীপক রচনা সম্ভার।

আমি মনে করি, জগৎসভায় একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, আত্মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র এবং সুন্দর পরিবেশে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই গ্রন্থটি উদ্বুদ্ধ করবে।

আশাকরি, স্নেহভাজন সরদার আবদুর রহমান ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ আমাদের জাতিকে উপহার দিবেন।

০৯.০৪.০৫

(প্রফেসর ড. এম. সরওয়ার জাহান)
পরিচালক
ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Institute of Environmental Science, 4th Science Building, University of Rajshahi, Bangladesh

www.nagorikpathagar.com

পরিবেশ এ্যালবাম

সূচিপত্র

- উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয় ৮
- ডেট লাইন চাঁপাইনবাবগঞ্জ
  ফারাক্কা বিপর্যয়ের আরেক রূপ ২৪
- উত্তরাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিবেশের হালচাল ৩০
- আর্সেনিক কবলিত এক জনপদ ৪৪
- ভিতর থেকে পাল্টে যাচ্ছে বরেন্দ্র চিত্র
  সবকিছু হচ্ছে পরিবেশ অনুকূল ৪৯
- বরেন্দ্র পরিবেশ উন্নয়নে বিএমডিএ'র ভূমিকা ৬৭
- পরিবেশ এ্যালবাম ৭৬

www.nagorikpathagar.com

বাঁধ দিয়ে ভারতের পানি লুণ্ঠন ॥
অপরিকল্পিত সেতু ও সেচ প্রকল্প ॥

৬০ টি নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন

দেশের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ নদীতে বাঁধ দিয়ে ভারত একতরফা পানি লুণ্ঠনের ধারা অব্যাহত রাখায় ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি হয়েছে। এসব নদী বছরের ৮/৯ মাসই থাকছে প্রবাহহীন। শাখা প্রশাখা মিলে অন্ততঃ ৫০টি নদীর তলদেশ বিস্তীর্ণ মরুসদৃশ বালুচরের দখলে। এই সঙ্গে সেতু, রেগুলেটর ও বাঁধের অপরিকল্পিত কার্যক্রমও সামগ্রিক পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপন্ন হয়েছে আরো ১০টি নদী।

পদ্মা নদীতে ভারত ফারাক্কা বাঁধ দেবার পর গত ২৪ বছরে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ প্রায় ৫৫ হাজার কিউসেক হ্রাস পেয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শুকনো মওসুমে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ পয়েন্টে পানির গড় প্রবাহ ছিল ১ লাখ ৫ হাজার কিউসেক, কিন্তু ফারাক্কা বাঁধ চালু করা মাত্র এই প্রবাহ ৭৪ হাজার কিউসেকে নেমে যায়। আবার ১৯৭৫-৭৬ সালের রেকর্ড থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রবাহ হ্রাস পায় আরো ২৪ হাজার কিউসেক। পানির প্রবাহ প্রতিবছর গড়ে ১ হাজার কিউসেক হারে এবং পানির উচ্চতা ১৪ সেঃমিঃ থেকে ২০ সেঃমিঃ হারে হ্রাস পেয়ে চলেছে। পদ্মায় শুকনো মওসুমে প্রায় ৪শ' কিলোমিটার জুড়ে চর পড়েছে।

নদীর উভয় প্রান্তের বাংলাদেশবর্তী ২০টি জেলার ৩২টি শাখা-উপশাখাও বিলুপ্তির কবলে। এসব নদীর মধ্যে আছে ছোটপদ্মা, গড়াই, মধুমতি, কালিগঙ্গা, পশুর, ভোলা, বড়দিয়া, কারিকুমার, হিসনা, সাগরখালি, চন্দনা, ভৈরব, ভদ্রা, কপোতাক্ষ, বৈতলা, কুমার, চিত্রা, বেগবতি, হরিহর, চিকনাই, নবগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, ইছামতি, ধলাই, কাজলা, হুরাসাগর, বড়াল, আড়িয়াল খাঁ, বেতর, নাগর, মরাবড়াল, মুসাখান প্রভৃতি। এসব নদী পদ্মার ধারা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে হয়ে যাচ্ছে ভরাট, নদী শুন্য হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে এই অঞ্চলের প্রকৃতি।

ভারত বাঁধ দিয়েছে উত্তরের ৫টি নদীতে। এগুলো হলো, তিস্তা, মহানন্দা, করতোয়া, আত্রাই ও ধরলা। একারণে এসব নদী ছাড়াও পুনর্ভবা, টাঙ্গন, চাওয়াই, টেপা, নাগর ও চিলকা নদী এখন নদী হিসেবে চেনা দায়। বিশেষতঃ মহানন্দায় শুকনো মওসুমে শিশুরাও হেঁটে নদী পার হতে পারে। পুনর্ভবাকে নদী হিসেবেই চেনা যায় না। কেবল একটি ধারা চিহ্নিত করা যায় মাত্র। এছাড়া ডাহুক, তিরনাই, ভেরসা, পাথরাজ, হাতুড়ি, সিনুয়া প্রভৃতিও একেবারে চিরতরে হারিয়ে যাবার উপক্রম।

www.nagorikpathagar.com

বিপন্ন যমুনা

এদিকে দেশের অন্যতম প্রধান নদী যমুনায় অসংখ্য চর পড়ায় এবং এর প্রবাহ মারাত্মকরকম হ্রাস পাবার ফলেও এর শাখা-উপশাখা নদীগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। যমুনার প্রায় দু'শো কিলোমিটার ও শাখাগুলোর দেড় হাজার কিলোমিটার এলাকার দু'পাশের হাজার হাজার জনপদে পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। যমুনা সেতু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটালেও এই সেতু নদীর প্রবাহকে থামিয়ে দিয়েছে। নদীর স্রোতধারা থেকে প্রাণ ফিরে পাওয়া নদীগুলোর অস্তিত্বও মুছে যাবার উপক্রম। এসব নদীর মধ্যে রয়েছে, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, আত্রাই, বারনই, শিব, ছোট যমুনা, তিস্তা, ধরলা, তুলসীগঙ্গা, বাঙালী, নাগর, যমুনেশ্বরী প্রভৃতি। যমুনা সেতু নির্মাণের ফলে যে পরিবেশগত সমস্যা হবে তা দূর করার জন্য ১৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প থাকলেও তা কেবল সেতুর পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু সুদুর চিলমারী-রৌমারী থেকে শাহজাদপুর দৌলতপুর পর্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশ রক্ষায় কোন ব্যবস্থা নেই। বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ যমুনা নদীর সুবিশাল বক্ষকে গাইড বাঁধের ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে তার আকার ও প্রবাহকে এক সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ করায় নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সেচ প্রকল্প

এখানেই শেষ নয়, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও তথাকথিত সেচ প্রকল্পও এই অঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। রাজশাহী জেলার চারঘাটে বড়াল রেগুলেটর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অপরিকল্পিত এই রেগুলেটর রাজশাহী, নাটোর ও পাবনার এক বিরাট অংশের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। ১৯৮৪ সালে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই রেগুলেটরের মাধ্যমে বড়াল নদীতে পানি সংরক্ষণের কথা থাকলেও এর নির্মাণ ত্রুটির কারণে বিপরীত ফল ফলে। এই নদীর সঙ্গে যুক্ত মুসাখান ও নারদ নদীও পানিবঞ্চিত হয়। এভাবে চলনবিল প্রকল্প, পোল্ডার-ডি প্রকল্প, তুলশীগঙ্গা প্রকল্প প্রভৃতি অপরিকল্পিত ও অসম্পূর্ণ প্রকল্প লাখ লাখ একর জমির জন্য বুমেরাং হয়েছে।

ক্ষতির পরিমাণ সীমাহীন

এসব নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবার ফলে সাধারণভাবে নৌপথ তো বন্ধ হয়েছেই, প্রাকৃতিকভাবেও কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা ভাবতে শরীর শিউরে ওঠে। মৎস্য সম্পদ বিলুপ্ত হবার পাশাপাশি অন্যান্য জলজ প্রাণীও হুমকির সম্মুখীন। নদীর বালুচর উত্তপ্ত হয়ে আবহাওয়ার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বাতাসের সঙ্গে ধুলোবালির বিশাল আস্তরণ গিয়ে পড়ে জনপদে। পরিবেশ হয় আবর্জনাময়। মানব ও প্রাণীর শরীরে পড়ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কৃষি কাজে সেচের জন্য পানি পাওয়া যেত না। আবার ভূ-গর্ভের পানির স্তরও

www.nagorikpathagar.com

নীচে নেমে যেত। ফলে খাবার পানির সংকট তীব্র হয়েছে। প্রতিবছর শুকনো মওসুম জুড়ে এক চরম হাহাকার দেখা দেয় খাবার পানির জন্য। নদীর বুকে চর শধু শুকনো মওসুমেই পড়ছে না, স্থায়ী রূপ নিচ্ছে এগুলো। পানির প্রবাহ না থাকায় নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে যায়। বর্ষার সময় পাড়ের পলি জমে চাষাবাদের উপযোগী হচ্ছে। পদ্মাসহ বহু সংখ্যক নদীর তলায় স্থায়ী বন গড়ে তোলা হচ্ছে। মানুষের বসবাসের জন্য আবাসিক এলাকা গড়ে উঠছে। বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ তো আছেই। এসব কার্যক্রমের ফলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মানুষের আশ্রয় ও খাদ্যের সংস্থান হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হলেও বাস্তবে এক ভয়াল পরিণতি অপেক্ষা করছে প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য। নদী হারিয়ে এক রুক্ষ-শুষ্ক মরুময় পরিবেশকেই আহ্বান জানানো হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে। যার লক্ষণ ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

বহু প্রজাতির বন্য ও জলজ প্রাণী পাখি বৃক্ষলতা বিলুপ্ত

ইকোসিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত

দেশের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী, মাছ ও জলচর প্রাণী, কীট-পতঙ্গ এবং বৃক্ষলতার অনেক প্রজাতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। ফলে এই অঞ্চলের পরিবেশে আপাতঃ অদৃশ্য অথচ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এতে সার্বিক পরিবেশ 'ইকোসিস্টেমে' মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বন্যা ও খরার প্রাদুর্ভাব, আবাসিক এলাকা, বিদ্যুৎ লাইন ও মহাসড়ক সম্প্রসারণ, বনের মধ্যে ও বাইরের বৃক্ষ কেটে ফেলা, জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত প্রয়োগ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, গুঁইসাপ প্রভৃতির বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং বন্য প্রাণীকে উপজাতি শ্রেণীর লোকদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার প্রভৃতি নানাবিধ কারণ এই পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ।

বন্য প্রাণী উজাড়

সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ বন্যার সময়ে গ্রাম-গ্রামাঞ্চলের শত-সহস্র প্রাণী লোক চক্ষুর অন্তরালে ধ্বংস হয়ে গেছে। সরকারীভাবে গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা হলেও বন্যপ্রাণীর কোন পরিসংখ্যান নেয়া হয়নি। ছোট ছোট ঝোঁপ-ঝাড় ও গর্তে আশ্রয় নিয়ে থাকা এসব প্রাণীর মধ্যে ছিল, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বনবিড়াল, বাগড়াঁশ, খাটাশ, বেজী, উদবিড়াল, খরগোশ, সজারু প্রভৃতি। মানুষ যে কোনভাবে আশ্রয় নিয়ে বন্যার কবল থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারলেও এসব প্রাণীর কোন ঠাঁই ছিল না। ফলে বন্যার তোড়ে এসব জন্তুকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

মহাসড়ক সম্প্রসারণের কারণেও বহু বন্যপ্রাণী প্রাণ দিচ্ছে নিরন্তর। সড়ক পারাপার হতে গিয়ে রাতের প্রথম ও শেষ প্রহরে প্রতিদিন প্রাণ দিচ্ছে শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বনবিড়াল, খাটাশ, বেজী, বাগডাঁশ, উদ ও অন্যান্য ছোট-খাটো প্রাণী। উপজাতীদের খাদ্য তালিকাভুক্ত হয়ে তীর-ধনুক ও বল্লম-ফার্সার আঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে বনবিড়াল ছাড়াও খরগোশ, গুঁইসাপ, বেজী প্রভৃতি। চামড়া শিকারীদের হাতে নিধন হচ্ছে সোনাগুঁই, কালোগুঁই, বড়গুঁই ও হুনগুঁই জাতীয় প্রাণী। দেশের বিরাট অংশেই এসব প্রাণী আর চোখে পড়ে না। এই অঞ্চলের বন উজাড় হয়ে গত কয়েকদশকে অন্ততঃ ১৮টি প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে। বিশিষ্ট প্রাণী বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বনমহিষ, বন গরু, চিতা, তিন শ্রেণীর গন্ডার, বারশিংগা হরিণ, মার্বেল চোখ হরিণ, সোনালী বিড়াল, নাচুনে হরিণ, নেকড়ে, মিঠা পানির কুমির, নীলগাই, রাজশকুন, সাধারণ ময়ুর ও কর্মী ময়ুর, বেঙ্গল ফুরিকেন প্রভৃতি আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন থেকে এসব প্রাণীসহ জলাশয়েরও অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ শালবাগান কেটে ফেলার পরিণতিতে বহু পাখি হারিয়েছে আশ্রয় ও বংশ বৃদ্ধির সুযোগ। মহাসড়কের দু' পাশের সুপ্রাচীন বৃক্ষসারি কেটে ফেলা হচ্ছে। এসব কারণে বাদুড়, শকুন, চিল, পেঁচা, হাড়গিলে, শঙ্খচিল, ভুবন চল, গাংচিল, গয়ার, কোকিল, ঘুঘু, টিয়া, কাঠঠোকরা প্রভৃতি পাখি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ লাইনে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছে বহু বাদুড়।

'ফুড চেইন' ক্ষতিগ্রস্ত

পদ্মা-যমুনাসহ অর্ধশতাধিক নদীর ভরাট হয়ে যাওয়া এবং খাল-বিলের তলদেশ আবাদী জমিতে পরিণত হওয়ার ফলে এবং বাঁধ ও রেগুলেটরের প্রতিবন্ধকতায় দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের জলাভূমির 'খাদ্য-শৃঙ্খল' তথা ফুড চেইনের অন্তর্ভূক্ত প্রাণীকুল অব্যাহত গতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের জলাভূমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটছে। জলাশয় নির্ভর পক্ষী শ্রেণীর বক, মাছরাঙা, ডাহুক, সারস, বৃহৎ পানকৌড়ি, মদনটেক, কোদালীবক, নীলশির হাঁস, পান্তামুখী হাঁস, বুটি হাঁস, চীনা বক, গগনভের, মানিকজোড় এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে ঘড়িয়াল, তিমির, গাঙের শুশুক, কচ্ছপ, কোলাব্যাঙ, জলডোয়া, মেছোবিড়াল, ভোদড়, সংকোচ প্রভৃতি প্রায় হারিয়ে গেছে। পদ্মার ঘড়িয়ালের অস্তিত্ব একদশক আগেও ছিল। কিন্তু পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ায় এবং জেলেদের হাতে পড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। পদ্মার ঘড়িয়ালের শেষ দুই বংশধর এখন রাজশাহী চিড়িয়াখানায় শোভা পাচ্ছে। জলাশয়গুলো হারিয়ে যাবার ফলে এবং শিকারীদের অত্যাচারে যাযাবর পাখির আগমন আর ঘটে না।

www.nagorikpathagar.com

৪১ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত

দেশের এই অঞ্চল থেকে মাত্র গত এক যুগে অন্ততঃ ৪১টি প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। আরও অন্ততঃ ১০টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের জরিপ সূত্রে জানা যায়, নদ-নদী ও খালে-বিলে পানি হ্রাস পাওয়া, বাঁধ নির্মাণ, জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এবং বিদেশী জাতের মাছ চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বহু বছরের মৎস্য সম্পদের এসব শ্রেণী বিলুপ্ত হচ্ছে। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মাছের মধ্যে আছে, শংখ, ফাঁসা, ভেদা, চার প্রকারের পুঁটি, খয়েরা, পাবদা, পানিকই, বাচা, মিলন, হলুদ টেংরা, বেলে মাছ, আইড প্রভৃতি। পদ্মা নদীর বিখ্যাত পাঙাস মাছ দুর্লভ হয়ে পড়ায় আজ 'সোনার মতো দামী'। ফারাক্কার কারণে প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যাবার ফলে সমুদ্রের ইলিশের এই অঞ্চলে আগমন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

জীববৈচিত্র্য হ্রাস

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, বৃহত্তর রাজশাহীসহ বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসায় এখানকার জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ গবেষণা কেন্দ্রের পরিবেশিত এই তথ্যে বলা হয়েছে, গো-চারণ ভূমির বিলুপ্তি, জলজ উদ্ভিদপূর্ণ পুকুর ও ঝোঁপজঙ্গল নিঃশেষ হওয়া এবং কীটনাশক প্রয়োগের ফলে এই বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। কৃষকের বন্ধু ব্যাঙ ও কেঁচোর অস্তিত্ব বিপন্ন। জমির জন্য উপকারী কীট-পতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঝোপ-ঝাড় কেটে সাফ করার ফলে ছোট ছোট পাখি ও অন্যান্য জীবজন্তুও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

গাছের প্রজাতি বিলুপ্ত

জঙ্গল সাফ করে আবাস, রাস্তা ও কৃষি জমি তৈরীর ফলে অনেক প্রকার উদ্ভিদের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে। আসবাবপত্র হিসেবে কাজে লাগে না বলে ছায়াদানকারী ও পরিবেশের অনুকূল বট ও অশ্বত্থ জাতীয় বৃক্ষ প্রায় শেষ করে ফেলা হয়েছে। এছাড়া, ভেষজ কাজে লাগতে পারে, এমন গাছের মধ্যে অর্জুন, আমলকী, বহেরা, হরিতকি, শ্বেতকমল, তুলশী, পিপুল, উলটকমল, হাতিসুর, নিশিন্দা, বাসকপাতা, তেলাকুচা, ভৃঙ্গরাজ, শ্বতমূল প্রভৃতি দস্তুর মতো দুর্লভ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে নয়া বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের আওতায় এমনসব ফলফুলহীন গাছ লাগানো হচ্ছে, যেগুলোতে দেশী পাখি আকৃষ্ট হয় না। কিছু কিছু গাছ যেমন ইউক্যালিপটাস ও রেইনট্রি আমাদের দেশীয় পরিবেশের অনুকূল নয় বলে কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন। কিন্তু এগুলো লাগানো হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

www.nagorikpathagar.com

৫০ প্রকার বিষ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার
গন্ধক-দস্তার ঘাটতি ব্যাপক ॥ উর্বরতা বিনষ্ট

দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষি জমি ব্যাপকভাবে উর্বরাশক্তি হারিয়েছে। লাখ লাখ একর জমিতে গন্ধক ও দস্তাসহ জৈব উপাদানের ঘাটতি হয়েছে। অপরিকল্পিত ও অজ্ঞতাজনিত রাসায়নিক সার, নিম্নমানের ভারতীয় কীটনাশকের ব্যবসায়িক ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে প্রলুব্ধ করা, কৃষকের বন্ধু কেঁচো ও ব্যাঙসহ বিভিন্ন উপকারী প্রাণীর বিলুপ্তি প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলের কৃষি ও সার্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট সম্প্রতি এই অঞ্চলের মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে এতে রাসায়নিক পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করে কৃষি জমির জন্য রীতিমতো অশনি সংকেত দিয়েছে। এতে দেখা যায়, কৃষি জমি সুষম হবার জন্য যে সকল উপাদান থাকা দরকার তাতে ব্যাপক হেরফের হয়েছে। কোন কোন উপাদান সর্বনিম্ন পর্যায়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। কৃষি উপযোগী জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, গন্ধক, বোরন, তামা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি থাকা দরকার বিভিন্ন মাত্রায়। কিন্তু এই অঞ্চলের মাটিতে নাইট্রোজেনের আধিক্য রয়েছে। মৃৎবিজ্ঞানী ও কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি মিলিগ্রাম মাটিতে নাইট্রোজেন থাকা উচিত ৭৫ থেকে ৩শ' মাইক্রোগ্রাম। ফসফরাস ১২ থেকে ৭৫ মাইক্রোগ্রাম, বোরন দশমিক ২ থেকে দশমিক ৪ মাইক্রোগ্রাম, তামা ১ থেকে ১০.০০ মাইক্রোগ্রাম ও দস্তা ২০ মাইক্রোগ্রাম থেকে ১৮.০০ মাগ্রাম। রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৯০ শতাংশ জমিতে কোন কোন উপাদান শূন্যের কোঠায়। অনেক উপাদান রয়েছে বিপদজনক হারে। প্রতি মিলিগ্রাম মাটিতে তামার পরিমাণ ১৫ মাইক্রোগ্রাম এবং লোহার পরিমাণ ২২৩ মাইক্রোগ্রাম ও ম্যাঙ্গানিজ ৬০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত। বরেন্দ্র ও তিস্তা অঞ্চলের মাটিতে ফসফরাসের ঘাটতি মারাত্মক। প্রতি মিলিগ্রাম মাটিতে যেখানে ৬ থেকে ৭.৩ মাইক্রোগ্রাম অম্লত্ব থাকা উচিত, সেখানে কোথাও রয়েছে ২.৬ মাইক্রোগ্রাম আর কোথাও ১০.৯ মাইক্রোগ্রাম। পদ্মা ও গঙ্গা অববাহিকায় মাত্রাতিরিক্ত এই অম্লত্ব আরো মারাত্মক পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। এর উপর মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহার করে জমির অম্লত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, জৈব পদার্থের পরিমাণ ২ থেকে ৩ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। জৈব পদার্থ হ্রাস পাবার অন্যতম কারণ হলো, জমিতে খড় ও গাছের অবশিষ্ট অংশ পচে এর অভাব পূরণ হবার সুযোগ আর থাকছে না– এগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবার কারণে। এই অঞ্চলের অন্ততঃ ৪০ লাখ হেক্টর জমি বিশেষ করে গন্ধক ও দস্তার ঘাটতির শিকার হয়েছে বলে সাম্প্রতিক এক তথ্যে জানা গেছে। বিশেষতঃ পঞ্চগড়, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, সাতক্ষীরা, প্রভৃতি জেলায় দস্তার ঘাটতি হয়েছে। গন্ধকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে ঠাকুরগাঁও,

www.nagorikpathagar.com

রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি জেলাসমূহের জমিতে। বিশেষজ্ঞ সূত্রে জানা গেছে, বিরতিহীনভাবে জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য চাষ, জমি একাধারে দীর্ঘদিন প্লাবিত থাকা এবং অবিরাম গন্ধকহীন সার ব্যবহার করলে জমিতে গন্ধকের ঘাটতি দেখা দেয়। উল্লিখিত কারণ ছাড়াও জমিতে ক্ষারত্ব বেশী হলে দস্তা বা জিংকের ঘাটতি হয়। দস্তা ও গন্ধকের ঘাটতিসম্পন্ন জমিতে পরিমাণ মতো জিপসাম ও জিংক সালফেট ব্যবহার এবং সবুজ সারসহ প্রচুর জৈব সার ব্যবহারেই কেবল এই ঘাটতি দূর হতে পারে।

নিষিদ্ধ কীটনাশক ও সার

সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এই অঞ্চলে অন্ততঃ ২০ ধরনের নিষিদ্ধ রাসায়নিক সার ও নিষিদ্ধ ডার্টি ডজন গ্রুপের কীটনাশক বৈধ ও অবৈধভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা গেছে। বালাই দমনের নামে দরিদ্র কৃষকরা সস্তায় যে কীটনাশক ব্যবহার করছে এর মধ্যে রয়েছে ডায়াজিনন, বাসুডিন, ডাইমেক্রন, ইন্ডোফিল, কুমুলাস, ডিএফ, সানটাপ, পাইরিক্স, হিনোসন, কুপ্রাভিট, গোলতীর, থিলোভিট, রোভরাল, রিজেন্ট, মেটাসিসটক্স, টামারান, নগম, একালাস, রনষ্টার, একালাক্স, নুভক্রন, ম্যালটক, ম্যালথিয়ন, সুমোডি, ডারসবান, সেগকস ও টাকগার। সেই সাথে রয়েছে ডার্টি ডজনভুক্ত কীটনাশক এ্যালডিকার্ড, ক্যামফ্লিকোর, ক্লোডেন, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডিমেরকরম, ডিপিসিবি, ডিডিটি, এলড্রিন, এসডিবি, এইচসিএইচ, বিএইচসি, লিনডেন, প্যারাকুয়াট, প্যারাথিন, মিথাইল, পিসিপি ইত্যাদি কীটনাশক। যদিও সারা পশ্চিম জগতে এসব কীটনাশক নিষিদ্ধ। ভারতের নিষিদ্ধ রাসায়নিক সার, কীটনাশক সীমান্তপথ দিয়ে চোরাচালানীদের মাধ্যমে আসছে। এগুলো দামে সস্তা। এসব কীটনাশকের মধ্যে রয়েছে ডিডিটি, আজানল, বুটাকুলার, হিলাতন, গ্যামাকসিন, সুমিথিয়ন, নগজ, শানকুয়ান, বাসুডিন ৯০জি ইত্যাদি। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের সীমান্ত দিয়ে দেদার আসছে এসব কীটনাশক। একথা কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীরা স্বীকার করেছে। ভারতীয় এসএসপি সার এই অঞ্চলের কৃষকদের সর্বনাশ করে চলেছে অব্যাহতভাবে।

কেঁচো ও ব্যাঙ ধ্বংস

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এই অঞ্চলের কৃষক বন্ধু কেঁচো ও ব্যাঙ ধ্বংসের পথে। প্রকৃতির লাঙল কেঁচো আর জমিতে দেখা যায় না। ব্যাঙ প্রতিদিন একশ' টনেরও বেশী পোকা-মাকড় ও কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু ব্যাঙের পা রফতানির অবাধ প্রক্রিয়ায় এই ব্যাঙ সম্পদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার পথে। পাশাপাশি

www.nagorikpathagar.com

ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক ব্যবহারে ব্যাঙ নিজে মরছে, কীটনাশকে তার খাদ্যও নিঃশেষ হচ্ছে। ফসলের প্রজননের জন্য উপকারী মৌমাছিসহ বিভিন্ন পতঙ্গ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কীটনাশকের প্রভাবে। সম্প্রতি প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, কীটনাশক প্রয়োগের ফলে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের উপস্থিতি শতকরা ৬৩ ভাগ থাকে এবং কীটনাশক প্রয়োগ না করলে এর উপস্থিতি থাকে মাত্র ২৮ ভাগ। পাশাপাশি ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে এমন উপকারী পোকামাকড় কীটনাশক প্রয়োগ করলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৩৭ ভাগ। আর তা প্রয়োগ না করলে উপকারী পোকার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬ ভাগ। অন্যদিকে বিষ প্রয়োগ করা না হলে জমির ক্ষতি হয় মাত্র ২ ভাগ। আর বিষ প্রয়োগে ক্ষতি হয় শতকরা ১৭ ভাগ। এই ক্ষতির পরিমাণ জমি ছাড়িয়ে মানব দেহসহ সার্বিক পরিবেশের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। গবাদি পশুর দেহে এর প্রতিক্রিয়া হয়ে এবং শাক-সবজির মাধ্যমে মানব শরীরেও মারাত্মক বিক্রিয়া করে চলেছে নীরবে।

উফশীর আবাদ সম্প্রসারণ

অল্প জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন প্রয়োজন- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে উত্তরাঞ্চলের খাদ্য ভান্ডারকে ইতোপূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসল আবাদের লক্ষ্যে কৃষকদের আকৃষ্ট করেছে বিভিন্ন বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থা। তারা সমন্বিত ও চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াই বীজ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে এই ফলন বৃদ্ধির জন্য মাঠে কাজ করছে। যা সার্বিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা হয় নি। পরবর্তীকালে কৃষি বিভাগের উদ্যোগে উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদকে ইতিবাচকভাবে নেয়া হয় এবং এজন্য বিশেষ কর্মসূচী নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আইপিএম নাম কার্যক্রমও এক্ষেত্রে বিশেষ সুফল দেয়।

অসম বৃষ্টি তাপমাত্রা বৃদ্ধি ।। পানির স্তর নিম্নগামী মরু প্রবণতা আশংকাজনক

দেশের উত্তরাঞ্চলে মরু প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিবছর বৃষ্টিপাতের সমবিতরণ যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের পরিবর্তে ভূ-গর্ভের পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এর অন্যতম কারণ বলে জানা গেছে।

এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় এক বিচিত্র গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চৈত্র-বৈশাখে দিনে খরা, রাতে শীত, সকালে কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে প্রকৃতি। এই দৃশ্য গ্রীষ্মকালে নিয়মিত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। পর্যবেক্ষকরা এই অবস্থাকে মরু এলাকার প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

www.nagorikpathagar.com

অসম বৃষ্টিপাত

রাজশাহী অঞ্চলের প্রাপ্ত হিসেবে দেখা যায়, গত প্রায় দশ বছরে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ব্যাপক হেরফের হয়েছে। ১৯৯০ সালে মোট বৃষ্টি হয়েছিল ১৮৭০ মিলিমিটার। পরের বছর তা হ্রাস পেয়ে ১৩৯৫ মিঃমিঃ নেমে যায়। ১৯৯২ সালে ছিল আরো শোচনীয় অবস্থা, একেবারে ৮৪২ মিঃমিঃ। ১৯৯৭ সালে সর্বাধিক ২০৮২ মিঃমিঃ বৃষ্টি হলেও পরের বছর ১৯৯৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১৪৮২ মিঃ মিটার দাঁড়ায়। এমনিভাবে মাস ভিত্তিতে এর পরিমাণেও ব্যাপক উঠানামা হয়। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪০ মিঃমিঃ বৃষ্টিপাত হলেও পরের বছরগুলোতে ২০ থেকে ৩০ মিঃ মিটারে হ্রাস পেয়েছে। গতবছর (১৯৯৮) ফেব্রুয়ারীতে হয়েছে মাত্র ৫ মিঃমিঃ। মার্চ ও এপ্রিল মাসে একইভাবে বছরওয়ারী বৃষ্টিপাত কমেছে। গতবছর মার্চে মাত্র ৯ মিঃমিঃ ও এপ্রিলে ৩৩ মিঃমিঃ বৃষ্টি হয়েছে। চলতি বছর (১৯৯৯) একই সময়ে মার্চে কোন বৃষ্টি হয়নি, এপ্রিলে মাত্র ৯ মিঃমিঃ বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির মওসুম শুরু হয় মে মাস থেকে এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯৯০ সালের মে মাসে ২০৭ মিঃমিঃ বৃষ্টি হলেও পরের বছরগুলোতে তা ১৫০ মিঃ মিটারেও পৌঁছায়নি। গত বছর মে ১৯৯৮ মাসে মাত্র ১২৯ মিঃমিঃ বৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রতি জুনে যথাক্রমে ৩৩৭ মিঃমিঃ, ১৮৫, ৮০, ৪৩১, ২৮৮, ২৩৫, ২৮৪, ২৪২ ও ৯২ মিঃমিঃ বৃষ্টি হয়েছে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মোটামুটি বৃষ্টি হলেও বছরওয়ারী ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি

অসম বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষি ও ফসল উৎপাদনে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। ফল-ফসল সঠিকভাবে বৃদ্ধি ও পুষ্টি পাচ্ছে না। স্বাদও বিনষ্ট হচ্ছে। এমনিতেই দেশের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলে প্রায় অর্ধেক, তথাপি অসম বিতরণ বিরূপ আবহাওয়ার জন্ম দিচ্ছে। পাশাপাশি এই অঞ্চলের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাতাসে আর্দ্রতার হেরফের হচ্ছে। শীত-কুয়াশারও কোন রুটিন নেই।

গত দু'দশক আগে এই অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস উঠানামা করতো। এখন তা ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। যা মরুভূমির সাধারণ তাপমাত্রার সঙ্গে তুলনীয়। বিকেলে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ১৫ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায় কোন কোন বছর। আর্দ্রতাহীন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় প্রকৃতিতে যেন 'অনল প্রবাহ' বইতে শুরু করে। এতে শরীরের চামড়া পুড়ে যাবার উপক্রম হয়। প্রচন্ড খরায় প্রতিবছর গরমে মানুষ মারা যাবার ঘটনা বাংলাদেশে বলা যায় সাম্প্রতিক রেকর্ড।

খরার সময় তীব্র খরার পর শীতকালে আসে একেবারে বিপরীত অবস্থা। এ সময় তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে আসে। সাধারণতঃ ১০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় হাড় কাঁপানো শীত নামে। শীতে এই অঞ্চলে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে অভূতপূর্বভাবে। এছাড়া, গ্রীষ্ম মওসুমে রাতের বেলায় শীতের লেপ-কম্বলের ব্যবহার, আবার দিনের বেলা অসহনীয় গরম, ভোরের প্রকৃতি ঘন কুয়াশায় ঢাকা আর বিকেলে বৃষ্টিপাত এমন অদ্ভুত আচরণ ও বৈচিত্র্য

www.nagorikpathagar.com

এই অঞ্চলের প্রকৃতিতে সকল ঋতুর বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে ধরা পড়ে।

পানির স্তর নেমে যাওয়া

ভূ-গর্ভে পানির স্তর নেমে যাবার কারণেও উত্তরাঞ্চলে মরুপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক/দেড় দশক আগেও পনের-বিশ ফুট নিচে পানির স্তর পাওয়া যেতো। এখন ষাট-সত্তর ফুট খননের প্রয়োজন হয়। সেচের পানি ছাড়াও সাধারণ খাবার পানির চাহিদা পুরণের জন্য এখন সাধারণ টিউবওয়েলে ২৫ থেকে ৩০ ফুট গভীরে পানির নাগাল না পেয়ে ৫০-৬০ ফুট গভীর থেকে পানি উত্তোলনের জন্য তারাপাম্প ব্যবহার করতে হচ্ছে। পানির স্তর নেমে গিয়ে বছরের অধিকাংশ সময়ে প্রচলিত সেচযন্ত্র ও পাম্পগুলোর বেশীরভাগ হয় অচল থাকে, নতুবা ক্ষমতা অনুযায়ী পানি উত্তোলন করতে কার্যকর হয় না। এতে আর্থিক ক্ষতি ও সময়ের অপচয় ঘটে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ফেলার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা গত দেড়-দু'দশকে বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে ভূ-পৃষ্ঠে যে সামান্য পানি জমে থাকে, তা সেচ কাজে লাগানোর প্রবণতা কম থাকায় এই পানি শুকিয়ে উঠে যায়। সব মিলে জমিতে লবণ ও বালির পরিমাণ বেড়ে মরু আকার ধারণ করে। এই অঞ্চলে সেচের পানি পাবার জন্য গর্ত করে সেচ যন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে কৃষককে পানি পেতে হচ্ছে।

পানির অসম ব্যবহার

ষাটের দশকে দেশে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনকালে মূলতঃ ভূ-উপরিস্থিত পানির উৎস ব্যবহারের উপর, গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই পানির উৎস হ্রাস পাওয়ায় চাপ বাড়ে ভূ-গর্ভের প্রতি। কালক্রমে বড় বড় প্রকল্প আকারে পানি সম্পদ মাটির গভীর থেকে টেনে তোলার কাজ শুরু হয়। সাম্প্রতিককালে বরেন্দ্র অঞ্চলে ৬ হাজারের বেশী গভীর নলকূপ স্থাপন করে ফসল বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, এই অঞ্চলের শত শত খাল-বিলের কোন সংস্কার করা হয়নি। খাল-খনন কার্যক্রম একদা পরিত্যক্ত হয়েছে। খালগুলোকে পানির সংরক্ষণাগার হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় প্রকল্প গৃহীত হলেও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। ভূ-উপরিস্থ এই পানি ব্যবহার করলে নীচের পানির উপর চাপ হ্রাস পেতে পারে। বরেন্দ্র অঞ্চলে ৩শ মাইলের ছোট ছোট খাল ও ১৪ হাজার পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে এগুলোকে জলাধার হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল সেই '৮৫-৮৬ সালে। কিন্তু শেষ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি।

৮০-র দশকে দেশে অগভীর নলকূপ স্থাপন নিষিদ্ধ করলেও পরবর্তীকালে এই নিষেধাজ্ঞা ৪৪টি থানায় সীমাবদ্ধ করে। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের ২২টি থানা ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের সকল থানার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের কোথাও নিষেধাজ্ঞা

www.nagorikpathagar.com

কার্যকর থাকেনি। এডিবিকে বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু স্বয়ং এই সংস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পর এই বিষয়ে দেখাশোনার কেউ থাকেনি।

বন ও বৃক্ষ উজাড় হয়েছে নির্বিচারে
প্রচারণা সর্বস্ব কার্যক্রম দুরবস্থাকে চাপা দিয়েছে মাত্র

উত্তরাঞ্চলে মরু প্রবণতার প্রধান প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে বন ও বৃক্ষ উজাড় হয়ে যাওয়া। শতবর্ষ পূর্বে এই অঞ্চলে দিগন্ত বিস্তৃত বৃক্ষসারি ছিলো। ছিল লতাগুল্মের সমাহার। কিন্তু এসব বিলুপ্ত হয়েছে। এই মরু পরিস্থিতি দূর করতে যথেষ্ট ও পরিকল্পিত কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। প্রচারণা সর্বস্ব কর্মকাণ্ড মূল কাজের প্রকৃত অবস্থাকে চাপা দিয়েছে মাত্র।

উত্তরাঞ্চলে ৮৫ লাখ একর ভূমি রয়েছে। এর মধ্যে বনভূমি থাকা প্রয়োজন কমপক্ষে ১৫ লাখ একর। যাতে প্রকৃতিতে ভারসাম্য থাকে। সে ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে সরকারী বনভূমির পরিমাণ মাত্র ৪০ হাজার একর। বগুড়া ও পাবনা জেলায় কোন সরকারী বনভূমি নেই। দিনাজপুর ও নওগাঁর শালবন উজাড় হচ্ছে। কিন্তু শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে না। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিশালাকার বহু আম বাগান গত দু'দশকে একেবারে উজাড় হয়ে গেছে। রাজশাহী-নবাবগঞ্জ সড়ক, রাজশাহী-পাবনা-নগরবাড়ী সড়ক, নাটোর-বগুড়া-রংপুর সড়ক প্রভৃতি সম্প্রসারণ কাজের সময় দু'পাশে অবস্থিত শত শত মহীরুহ বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়েছে। এর পরিবেশগত ক্ষতি পূরণ করতে অর্ধশতাব্দী লাগবে। যদিও এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেই। কিছু গাছ লাগানো হলেও তা গরু মেরে জুতা দান করার শামিল। ছোট জাতের গাছে সে অভাব পূরণ হবার নয়। অন্যদিকে সাম্প্রতিক বন্যায় এই অঞ্চলের বৃক্ষ সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। অন্তত ৫০ লাখ গাছ মারা গেছে। এখনো বন্যার প্রভাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে গাছের মৃত্যু ঘটছে। এছাড়া জ্বালানি ও আসবাবপত্র তৈরীর কাজে গাছ কাটা হচ্ছে। ইটের ভাটায় দেদার ব্যবহার হচ্ছে গাছ। এভাবে প্রতিবছর শতকরা ৫ ভাগ গাছ নিঃশেষ হচ্ছে। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের ৭টি জেলায় কমবেশী যে বনভূমি রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা মাত্র প্রায় ৫ ভাগ। বাংলাদেশের মোট ভূমির তুলনায় শতকরা ২৩ দশমিক ৩৩ ভাগ জমি বনভূমি বা বৃক্ষসম্পদ বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কিন্তু বর্তমানে তা রয়েছে মাত্র ৯ ভাগ। উত্তরাঞ্চলে এই পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। এর পরিমাণ মাত্র ৫ থেকে ৭ ভাগের মধ্যে রয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ।

বরেন্দ্র পরিস্থিতি

ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায়, সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীকালে বরেন্দ্র অঞ্চলে ছিলো বিস্তৃত সবুজ বনভূমি। ১৮৫০ সালে বৃটিশ পর্যটক সাইমন বর্ণনা করেন, বৃহৎ বৃক্ষ আচ্ছাদিত

www.nagorikpathagar.com

বনাঞ্চল বা নীচুস্থানে কাঁটা ও গুল্ম দ্বারা বিস্তৃত ও উচ্চস্থানসমূহ শুষ্ক ও তৃণাবৃত। এ অঞ্চল এতো বিস্তৃত ও দীর্ঘ যে শিকারীর পক্ষে পশু শিকার প্রায় অসম্ভব। বন্যপশু যথা হরিণ, বন্য শুকর, চিতা ও বৃহৎ বাঘের উত্তম প্রজনন স্থল। ১৮৭৫ সালে হান্টার এই অঞ্চলকে কাঁটাপূর্ণ জঙ্গল হিসেবে দেখিয়েছেন। বৃক্ষের মধ্যে শিমুল, পিপুল, কুল, পাকুড়, বাঁশ প্রধান। ১৯১২-২২ বিবরণে নেপসন এই অঞ্চলকে জঙ্গল প্রায় পরিষ্কার দু'এক স্থানে ছোট ছোট কাঁটাবনের উপস্থিতি ছাড়া অন্যান্য এলাকা উঁচু-নীচু ক্ষেতে পরিণত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৮৫০ সালের পরবর্তী সময়ে নীল চাষ বন্ধ হবার পর এ কাজে নিয়োজিত সাঁওতাল শ্রমিকরাই প্রধানতঃ বরেন্দ্র অঞ্চলের জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে কৃষিভূমিতে পরিণত করে। এই ঐতিহাসিক বিবরণ থেকেই দেখা যায়, বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি কত দ্রুত এবং কত নৃশংসভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আজো এই ধারার কতকটা অব্যাহত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চলের বৃহত্তর অংশ জুড়ে বরেন্দ্র বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। এই এলাকার ৮ হাজার ৩শ' বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের প্রকৃতির ব্যাপক ও অপরিকল্পিত ধ্বংসের ফলে পরিবেশ আজ ভীষণভাবে বিপর্যস্ত।

গাছ উজাড়ের নানা প্রক্রিয়া

উত্তরাঞ্চলে বন সম্পদ উজাড় হবার পেছনে নানা কারণ ও প্রক্রিয়া কাজ করেছে। এর মধ্যে আছে বন অপসারণ করে কৃষি ও আবাসিক এলাকা সম্প্রসারণ এবং রাস্তা তৈরী। আরো আছে জ্বালানি হিসেবে গৃহস্থালীর কাজে ও ইটের ভাটায় গাছের ব্যবহার ও আসবাবপত্র তৈরীর জন্য গাছ কাটা। তথ্যে জানা গেছে, গত দু'দশকে জ্বালানি হিসেবেই গাছের ব্যবহার বেড়েছে ২৫০ ভাগ এবং অন্যান্য কাজে গাছের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০ ভাগ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা কর্মের ফলাফলে দেখা গেছে, ক্রমবর্ধমান জৈব জ্বালানির অভাব মেটাতে গ্রামে শতকরা ১৭ ভাগেরও বেশী গাছ ব্যবহার করা হচ্ছে। আর গ্রাম-শহর নির্বিশেষে বৃক্ষজাত জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে মোট প্রয়োজনের শতকরা ৬০ ভাগ। বনাঞ্চলের ১৫ থেকে ৪৫ ভাগ পর্যন্ত কৃষি কাজ অথবা অন্যভাবে দখল হয়ে আছে। তুলনামূলক চিত্রে দেখা গেছে একটি বড় পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে মাসে ১২৫ টাকার, কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে ২০৩ টাকার ও গোবর ঘুটে ২৭ টাকার। একটি ছোট পরিবারেও বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়েছে ৯৪ টাকার ও কাঠ ১২৫ টাকার। এই হিসেবের মধ্যে ইটের ভাটায় জ্বালানি ব্যবহারের বিষয় বাদ রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের ইট ভাটাগুলোতে জ্বালানির শতকরা ৯৮ ভাগই হচ্ছে গাছ। গত দেড় দশকে এই অঞ্চলে আমের উৎপাদন মার খাবার কারণে বাগান মালিকরা বড় বড় আমবাগান কেটে ফেলে। এসব গাছের বেশীরভাগই ইটের ভাটা ও করাত কলে চলে যায়। এ ধরনের বাগান তৈরীর কাজ এখন শুরু করলেও তা পুরণ হতে ৩০/৪০ বছর লাগবে। কিন্তু সে উদ্যোগও আর দেখা যাচ্ছে না।

www.nagorikpathagar.com

প্রকল্প কার্যকর নয়

উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বনায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহ পুরোপুরি কার্যকর হতে পারেনি। এছাড়া লাগানো গাছের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যায় উদাসীনতা এবং সঠিক পরিসংখ্যান না রাখাও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের সুফল প্রাপ্তিতে বাধা। চলতি দশকের গোড়ার দিকে উপজেলা বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীতে ৯১৮ একর জ্বালানি কাঠের বনভূমি তৈরীর প্রকল্প অর্ধেকের বেশী বাস্তবায়িত হয়। এসব জেলায় ৩৭০ একরে বাগান তৈরীর লক্ষ্যমাত্রার এক-তৃতীয়াংশেরও কম সফল হয়। প্রায় একই সময়ে উত্তরাঞ্চলে মরু প্রবণতা রোধে ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত দু'টি প্রকল্প শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। বন বিভাগ ৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই অঞ্চলে 'সামাজিক বন' তৈরীর কার্যক্রম হাতে নেয়। পরিকল্পনাগত ত্রুটি ও মাঠ পর্যায়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এর কিছু কাজ হবার পর তা পরিত্যক্ত হয়। লাগানো গাছগুলোও আর বাঁচানো যায়নি। তিন বছর মেয়াদী ৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ আরেকটি প্রকল্পও নানা সমস্যার আবর্তে পড়ে বাস্তবায়িত হতে পারেনি বলে জানা গেছে। সাম্প্রতিক সময়েও বন বিভাগ অর্থাভাবে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণে কোন বড় কর্মসূচী নিতে পারেনি। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা গাছ লাগানোর জন্য ছোট ছোট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু এগুলো পরিবেশের জন্য বড় রকম অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। এনজিওগুলো নামমাত্র বনায়নে অংশ নেয়। যদিও তাদের প্রচারণা বেশী। তাদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে তুঁতগাছ লাগানো। তারা রাস্তার পাশ দখল করে এই গাছ লাগায় বটে। কিন্তু রেশমের পলু পালনের কাজে লাগলেও বৃক্ষ হিসেবে কোন অবদান রাখে না।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ

উত্তরাঞ্চলে গত দেড় দশকে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষরোপণ বলতে বরেন্দ্র এলাকায় তুলনামূলকভাবে ভালো কাজ হয়েছে। বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২৫টি থানা এলাকায় প্রায় দেড় কোটি নতুন গাছ লাগিয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ২৮ থেকে ৩০ ভাগ মারা গেছে। বাকী গাছ সম্পদ হিসেবে যেমন বর্ধিত হচ্ছে, তেমনি পরিবেশে অবদান রাখছে। আগামী '৯৯-২০০০ সালে সমন্বিত প্রকল্প, নিবিড় বনায়ন ও গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পের আওতায় বরেন্দ্র এলাকায় ৯ লাখ বনজ ও ১ লাখ ৩৫ হাজার ফলজ গাছের চারা লাগানো হবে। তবে সূত্র জানায়, বরেন্দ্রের বৃক্ষরোপণ কাজে এনজিওরা নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, পরিবেশের সার্বিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে অধিক সংখ্যক ফলজ গাছের চারা লাগানোর প্রতি বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন। যাতে প্রাণীকূলও এ থেকে উপকৃত হতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

কৃষি সেচ বন পানি সম্পদের ব্যবহারে সমন্বিত কার্যক্রম ও মূল্যায়ন জরুরী

উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে যে বিপর্যয় ভয়াবহভাবে এগিয়ে আসছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে বহুমুখী ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

এই অঞ্চলে কৃষি, মৎস্য, বন, পরিবেশ, পানি সম্পদ প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যরত বিভাগগুলোর সমন্বয়ে পরিবেশের উপর একটি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে পরবর্তী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা ইতিমধ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তাদের মতামত জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এসব মতামত কাগজের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বিচ্ছিন্নভাবে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করে গৃহীত প্রকল্পসমূহ উপস্থিতভাবে ফলদায়ক মনে হলেও এসব কার্যক্রমের সুদুরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয় খুবই কম। পাশাপাশি, এই প্রতিক্রিয়া বিরূপ হলে তার ক্ষতিপূরণ কার্যক্রমকেও খুব গুরুত্ব দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে নগদ লাভালাভের ব্যাপারটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় বলে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে।

সার ও কীটনাশক ব্যবহারের বিকল্প

পরিবেশে বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কারণসমূহের মধ্যে রাসায়নিক সার ও বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার অন্যতম। এর বিকল্প ব্যবহারে জোর দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। কীট নিধনের জন্য ঢালাও বিষ প্রয়োগ পদ্ধতির প্রক্রিয়ায় ৫০টিরও বেশী উপকারী পোকা নিধন হয়ে থাকে। এদের সংখ্যা কম হলেও এরা উপকার করে থাকে অনেক বেশী। তাই সাম্প্রতিককালে 'সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক কৃষি বিভাগের কর্মসূচীর জোরদার বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারী পোকা কৃষকদের চিনিয়ে দেয়া এবং প্রাকৃতিক উপায়ে ক্ষতিকর পোকা নিধনের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি ধানের জমিতে গাছের ডাল পুঁতে কিংবা ধইঞ্চা গাছ লাগিয়ে বিবিধ উপকার পাবার প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। ধইঞ্চা গাছের ডালে পাখি বসে যেমন পোকা-মাকড় শিকার করতে পারে, তেমনি এই গাছের পাতা ও ডাল জমিতে জৈব সার হিসেবে খুবই সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। গোবর ও জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরী। কৃষি বিভাগ এ ক্ষেত্রে খুবই সীমিত কর্মসূচী নিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির স্বার্থে এই পদ্ধতির সম্প্রসারণ জোরদার করতে হবে। এ ছাড়াও ভারত থেকে নিম্নমানের সার ও বীজ আমদানির ক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আমদানি জরুরী হলে আইনগত ব্যবস্থায় এর মান যথাযথ নিরূপণ করে তবেই তা বাজারে ছাড়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। অবৈধ ও নিম্নমানের আমদানির ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থাও কঠোর করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

প্রাণী ও বৃক্ষের অস্তিত্ব রক্ষা

পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী বিভিন্ন প্রাণী ও বৃক্ষের অবলুপ্তি রোধ করতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। এ জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন তৈরী করে স্থানীয় বন্যপ্রাণীর বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। সে সাথে যে কোন পর্যায়ের 'শিকার' সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। বাদুড় জাতীয় প্রাণীদের বাঁচানোর জন্য বৈদ্যুতিক তার রাবার কোটেড করতে হবে। মহাসড়কে রাতে চলাচলকারী যানবাহনের কবল থেকে প্রাণীদের বাঁচাতে স্থান বিশেষে সড়কের পাশে বেড়া দেয়া এবং যান চালকদের সতর্ক করা যেতে পারে।

প্রকৃতির বন্ধু ব্যাঙ নিধন ও রফতানিও বিশেষ সময়ের জন্য বন্ধ রাখা যেতে পারে। বিলুপ্ত প্রায় বিভিন্ন জলজ প্রাণীর কৃত্রিম প্রজনন ও উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন- ঘড়িয়াল, বিভিন্ন ধরনের শুঁইসাপ, বেজী প্রভৃতি। এ ছাড়াও সংরক্ষিত অঞ্চল যেমন উদ্যান প্রভৃতিতে বিলুপ্তির শিকার গাছ বিশেষত ভেষজ উদ্ভিদ লাগানো ও তার বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। ইটের ভাটায় গাছ পোড়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। পরিবেশের ক্ষতিকর গাছ লাগানো বন্ধ ও ফলজ বৃক্ষের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে।

ফসলের প্যাটার্ন পরিবর্তন

বরেন্দ্রের পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের অভিমত, শত শত বছরের পরিক্রমায় প্রাকৃতিকভাবে যে ধরনের বনাঞ্চল গড়ে উঠেছিলো তার পরিবর্তে নিবিড় শস্য উৎপাদন বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। বৃক্ষ আচ্ছাদিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ও সুপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার দ্বারা এ অঞ্চলে মিশ্র কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার।

এ ছাড়াও এ অঞ্চলে বনায়নের জন্য এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত বৃক্ষ ও শষ্য প্রজাতির নির্বাচন দরকার। সেই সাথে উদ্ভিদজাত জ্বালানির পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানির সুলভ প্রাপ্তিও নিশ্চিত করা দরকার।

(রচনাকাল ঃ মে, ১৯৯৯ ইং)

www.nagorikpathagar.com

(**বিঃদ্রঃ** এই সিরিজ প্রতিবেদনটি জাতীয় পরিবেশ পুরস্কারে ভূষিত হয়। ১৯৯৯ সালের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম পরিবেশ রিপোর্টিং বিষয়ে প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। এতে বিচারকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন, জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান, (তৎকালীন) যুগান্তর সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, ইন্ডিপেনডেন্ট এর নির্বাহী সম্পাদক আমানুল্লাহ কবীর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ আহাদউজ্জামান মোহাম্মদ আলী।

প্রতিযোগিতায় রাজধানীসহ সারাদেশ থেকে ১০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। রিপোর্টিং বিষয়ের জন্য একমাত্র পুরস্কার প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করে এই সিরিজ রিপোর্টটি। এজন্য প্রতিবেদককে ২৫ হাজার টাকা, একটি ক্রেস্ট ও একটি সনদপত্র দেয়া হয়। পরে ১৪ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক্কই জেবির বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইনডিপেনডেন্ট সম্পাদক মাহবুবুল আলম, বাংলারবানীর নির্বাহী সম্পাদক শফিকুল আজিজ মুকুল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পুরস্কার তুলে দেন।)

www.nagorikpathagar.com

ডেট লাইন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঃ
ফারাক্কা বিপর্যয়ের আরেক রূপ

পদ্মা-পাগলা-মহানন্দা একাকার হবার উপক্রম

নদীগর্ভে বহু গ্রাম-জনপদ

এই বাংলাদেশেরই এক বিশাল বিস্তীর্ণ ও সমৃদ্ধ জনপদ। চোখের আড়ালে কীভাবে এক চরম ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হচ্ছে বিশ্বাস করা কঠিন। কেবল প্রাকৃতিক নয়, মানব সৃষ্ট বিপর্যয়ের আরেক নাম ফারাক্কা বাঁধের ধ্বংসলীলার অন্য একটি রূপ ধরা পড়েছে এখানে। জীবন-জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুই আর নিরাপদ নয় এই বিপন্ন ভূমিতে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পদ্মা ও পাগলা নদীর মাঝখানের সুবিস্তৃত ভূমি ধ্বংস করে এখন আরো উন্মত্ত হয়ে সম্মুখ পানে ধাবমান। অপর নদী মহানন্দার সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার জন্য যেন উন্মুখ পদ্মা ও পাগলার মিলিত স্রোতধারা। এই ত্রিস্রোতের মিলন প্রক্রিয়ার কবলে এর মধ্য ও তীরবর্তী মানুষেরা হারিয়ে ফেলেছে তাদের পিতৃ পুরুষের প্রিয় জমিন। এখনো চলছে ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া। আরো বহু সমৃদ্ধ জনপদ বিলুপ্তির উপক্রম।

ধ্বংসলীলার শিকার

পদ্মা নদীর স্রোতধারা দিক পাল্টে প্রতিবছরই বন্যার সময় প্রচণ্ড রূপ নিচ্ছে। ভারত সীমান্ত ছেড়ে বাংলাদেশের ভেতর প্রবেশের ফলে গত এক দশকে ধ্বংস করেছে অন্তত ৫০টি গ্রাম। আরো ২৫টি গ্রাম এই তালিকায় রয়েছে। নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়ন প্রায় পুরোটাই এখন নদীগর্ভে। এই ইউনিয়নের জন্দিপুর, নারায়ণপুর, সূর্য নারায়ণপুর, চরদিয়াড় নারায়ণপুরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। মাত্র ক'বছরেই বিলীন হয়েছে শিবগঞ্জ উপজেলার ছত্রাজিতপুর ইউনিয়নের বেশ ক'টি গ্রাম। এর মধ্যে আছে দোরশিয়া, পার ঘোড়াপাখিয়া, ভাসাপাড়া, কোলাপাড়া, ঢ্যালপাড়া, দফাদারপাড়া প্রভৃতি। ছত্রাজিতপুর ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম জানান, ১০/১২ বছর আগে পদ্মা ছত্রাজিতপুর থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরত্বে ছিল। এখন তা এক মাইলের মধ্যে এসে গেছে। তিনি জানান, ভাঙ্গন ঠেকানো না গেলে নদী সোনা মসজিদ স্থল বন্দরগামী মহাসড়ককেও গ্রাস করবে। পদ্মার ভাঙ্গনে বিলুপ্ত হয়েছে পাকা ইউনিয়নের লক্ষ্মী গৌরাঙ্গপুর, সাহুপুর ও পাকা, উজিরপুর ইউনিয়নের উজিরপুর, রাধাকান্তপুর ও চকবহরম প্রভৃতি। পদ্মা ও পাগলা নদীর ভাঙ্গনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সুন্দরপুর ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর ছয়রশিয়া, পাঁচ রশিয়া, আরাজীকালিনগর, এগাররোশিয়া ও বিশ্বনাথপুর মৌজার নিশানা মুছে যাবার পথে। ছত্রাজিতপুরের বর্তমান ভাঙ্গন কবলিত গ্রামগুলোর মধ্যে আছে পশ্চিম জাহাঙ্গীরপাড়া, পূর্ব জাহাঙ্গীরপাড়া, কৃষ্ণ চন্দ্রপুর, ধুলাউড়ি, উজিরপুর প্রভৃতি।

নদীগর্ভে বহু গ্রাম-জনপদ

www.nagorikpathagar.com

ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়নের ঘোড়াপাখিয়া দেবোত্তর ও ঘোড়াপাখিয়া মৌজাও এর অন্তর্ভূক্ত। পাগলার ভাঙ্গন অব্যাহত থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাবলাবনা, ফাটাপাড়া, চকবহরম গ্রাম। বিলুপ্তির সর্বশেষ শিকার হয়েছে সুন্দরপুরের আল মোস্তানের পাড়া ও মিজু মেম্বারের পাড়া। ইউনিয়নের বাকী অংশের পাকা বাড়ীঘর ও প্রতিষ্ঠান মানুষ ভেঙ্গে নিচ্ছে নদীতে হারিয়ে যাবার আশঙ্কায়।

ভাঙ্গনের অব্যাহত ধারায় কোন সুদূরের পদ্মা এখন সুন্দরপুর ইউনিয়নের মীরের চক নামক স্থানে অবস্থিত ট্যাকের কাছে যথারীতি পাগলার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এবারের বন্যায় এই মিলন ঘটেছে। পদ্মার প্রবল স্রোত পাগলায় ঢুকে এর প্রবেশ পথ আরো প্রশস্ত করেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে পাগলায়ও ভাঙ্গন বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিণতিতে অচিরেই আরো ২/১টি জনপদকে উড়িয়ে দিয়ে পদ্মা ও পাগলা মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

পদ্মার গতি রুদ্ধ করার এ এক নির্মম পরিণতি
বিপন্ন হবে নবাবগঞ্জ জেলা সদরের অস্তিত্ব

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা-পাগলা-মহানন্দার ত্রিধারা স্রোত একাকার হবার কারণ সম্পর্কে সরকারী পর্যায়ে প্রকৃত বক্তব্য কখনোই প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয় না। এই বিপর্যয় যে মূলত ফারাক্কা ও ভারত সীমান্তবর্তী অপরিকল্পিত বাঁধের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকাশ করা হয় না। এলাকার বিক্ষুব্ধ জনগণ সত্য উচ্চারণে দ্বিধান্বিত। সরকারী মহলের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

নদী ভাঙ্গন সব সময়েই ছিল প্রাকৃতিক দূর্যোগ হিসেবে। নদীর 'মতিগতি' পরিবর্তনের ধারায় এই ভাঙ্গন ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালুর পূর্বে তা এতোটা ভয়ঙ্কর ও বিপর্যয়কর ছিল না। রীতিমতো ২টি নদীর একীভূত হয়ে যাওয়া এবং আরেকটি নদীর সঙ্গে স্রোত মিলিত হবার উপক্রম হওয়া একটা বড় রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। খরার সময় নদীর স্রোত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়া আর বন্যার সময় তা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ানোর ফলে বিশেষজ্ঞদের হিসেব নিকেশই মেলানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।

ফারাক্কার সর্বনাশ

ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর সিকি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে পদ্মা নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এর তলদেশ ভরাট হয়েছে। একইভাবে ফারাক্কা বাঁধের বাম অংশের বেশ ক'টি গেটও পলি জমে বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এর ফলে মূল স্রোত বন্যার সময় বিপুল বেগে আছড়ে পড়ছে ডান অংশে। এ সময় বিপুল জলরাশির চাপ পড়ছে বাংলাদেশের

www.nagorikpathagar.com

৩টি বিডিআর বিওপি, ২ শতাধিক গভীর নলকূপ, ৩টি কৃষি অফিস, ৫ শতাধিক পাকা স্থাপনা, দেড় হাজার হস্তচালিত নলকূপ, ২টি ইউপি ভবন, ১টি ভূমি অফিস ও ১টি স্বাস্থ্য ক্লিনিক নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। নদীর চরের মানুষের উচ্চ শিক্ষার একমাত্র ভরসা ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কলেজ ও রাধাকান্তপুর মহাবিদ্যালয় নদীগর্ভে। এখন হুমকির মুখে পড়েছে ছত্রাজিতপুর মালাবক্স মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ ও কৃষ্ণ গোবিন্দপুর ডিগ্রী কলেজ। এসব প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা ধ্বংস হবার ফলে এই এলাকায় যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠা শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হয়েছে বিপর্যস্ত। এখানেই শেষ নয়, সার্বিক মানবতা যেন এক নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে নিঃশেষিত হয়েছে। ৫০ হাজার পরিবার তাদের বাড়ীঘর হারিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাধ্য হয়েছে। এক সীমাহীন ও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ-দুর্গতির শিকার হয়েছে তারা। নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পাওয়া অস্থাবর সম্পদ নিয়ে যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ নদীর অপর পাড়ে কোনো রকম বাঁশ-টিনের চালা তুলেছে। কেউবা আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানায় পাড়ি দিয়েছে। বহু পরিবার দূর বরেন্দ্রের উঁচু ভূমিতে কোনো রকম মাথা গোঁজার চেষ্টা করেছে। এভাবেই জীবন-জীবিকার সমৃদ্ধি হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। সুন্দরপুরের কৃষক সাদিকুল ইসলাম কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, জীবনের সব সঞ্চয় এখন নদীর তলায়। গ্রাম ডাক্তার আইনাল হক তার পেশায় যে পসার গড়ে তুলেছিলেন, তা হারিয়ে গেছে। নতুন অজানা স্থানে তা সৃষ্টি করতে পারা সম্ভব নয়। ফলে জীবিকা নিয়ে এক অনিশ্চয়তায় পড়তে হয়েছে। তিনি পাকা বাড়ীর ইট বিক্রি করে দেশান্তরী হবার উদ্যোগের বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্না চাপতে চেষ্টা করছিলেন। উজিরপুরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ধনী গৃহস্ত বললেন, তার একশ' বিঘা জমি নদীর গর্ভে। এখন ভিক্ষা করে খাবার দশা। এমন পরিবারও আছে ২শ'-আড়াইশ' বিঘা জমি থেকেও এখন পথের ভিখারী। এখন সব শেষ। এই গ্রামের একটি পরিবারের যুবকরা বৃদ্ধ পিতাকে বেঁধে রেখে ১৫ ঘর বিশিষ্ট বিশাল বাড়ী ভেঙ্গেছে। কারণ পিতা চায়নি তার রক্ত পানি করে তিল তিল করে তৈরী করা বাড়ী ভাঙ্গা হোক। কিন্তু পদ্মায় সবকিছু চলে যাবার চেয়ে অন্ততঃ ইটগুলো বাঁচানোর চেষ্টায় বাড়ী ভাঙ্গতে হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস

নদী ভাঙ্গনের এই প্রলয় শুধু হাজারো সংসারকেই উচ্ছেদ করেনি, রীতিমতো এলাকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। বিশেষত গাছপালা ধ্বংস হয়ে তলিয়ে গেছে নদীতে। আমের জন্য বিখ্যাত শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জের এই এলাকায় শত শত একর আমের বাগান উজাড় হয়েছে। এর সঙ্গে আছে কাঁঠাল ও পেয়ারাসহ অন্যান্য ফলের গাছ, আছে

www.nagorikpathagar.com

অংশে। আলোচ্য ভাঙ্গন অংশ থেকে মাত্র ২৫/২৬ কিলোমিটার দূরে ফারাক্কা বাঁধের অবস্থান। এই স্বল্প দূরত্বের মধ্যে পদ্মার স্রোত কি ভয়াবহ আকার ধারণ করে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গত এক দশকে ফারাক্কার মুখ খানিকটা সংকীর্ণ হয়ে যাবার কারণে এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে সীমান্তবর্তী বাংলাদেশীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথপুর থানার নিমতিতা নামক স্থানে ভারতীয়রা পদ্মায় একটি 'টি' বাঁধ নির্মাণ করেছে তাদের অংশের ভাঙ্গন ঠেকাতে। সেখানে স্রোতের একটি ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশের জনপদে এসে আঘাত হানছে। জনসাধারণের মতে এই 'টি' বাঁধ ভেঙ্গে দিলে বর্তমান পদ্মার স্রোত অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসবে। অবশ্য এ ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা এ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পদ্মা-পাগলার ভাঙ্গন ঠেকানো না গেলে এর অনিবার্য পরিণতি দাঁড়াবে মহানন্দার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তা চাঁপাইনবাবগঞ্জকে পর্যন্ত আঘাত করা। বর্তমানে দুই নদীর মিলিত স্থান থেকে মহানন্দার মুখ মাত্র প্রায় দুই কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করছে। পদ্মার স্রোত সুন্দরপুর ইউনিয়নে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই জায়গার বিলুপ্তি ঘটলে অতঃপর আঘাত সরাসরি পৌঁছবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার চরমোহনপুর, রেহাইচর, টিকরামপুর গ্রামে। অতঃপর তা সম্প্রসারিত হয়ে সরাসরি নবাবগঞ্জ শহরকে বিপন্ন করে তুলবে বলে নদী বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন। এমনকি এক পর্যায়ে নবাবগঞ্জ শহরের বুক দিয়ে পদ্মা নদীর ধারা প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব কিছু হবে না। যা হবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এক নজিরবিহীন ঘটনা।

একযুগে ধ্বংস হয়েছে দু'হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিপন্ন হয়েছে পরিবেশ

গত প্রায় একযুগে পদ্মা, পাগলা ও মহানন্দার ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্ততঃ দু'হাজার কোটি টাকার সম্পদ। বিপন্ন হয়েছে ৫০ হাজার পরিবারের প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। বিনষ্ট হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ।

ভাঙ্গনের কবলে পড়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ১০টি ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে ইউপি ভবন, সড়ক, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, সড়ক কাম বাঁধ, বন ও বৃক্ষ সম্পদ, পুকুর ও পুকুরের মাছ, স্লুইস গেট ও রেগুলেটর, গভীর নলকূপ, গ্রোথ সেন্টার, হাটবাজার, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, গোডাউন, ডাকঘর, হাই স্কুল, কলেজ, প্রাইমারী স্কুল ও মাদ্রাসা, ঈদগাহ ও গোরস্তান, ঘরবাড়ী ও মূল্যবান কৃষি জমি। বেসরকারী প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে জানা যায়, লক্ষাধিক একর আবাদী জমি, ১০ হাজার একর বসতি জমি, ৮টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২টি সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ, ৩০টি প্রাইমারী স্কুল, শতাধিক মসজিদ-ঈদগাহ, ৬টি মাদ্রাসা,

www.nagorikpathagar.com

বাঁশঝাড়সহ বনজ সম্পদ। এসব গাছ প্রচুর সংখ্যায় নদীতে ভেসে গেছে। যারা রক্ষা করতে পেরেছে পানির দরে বিক্রি করে দিয়েছে দূরের মহাজনের কাছে। এসব গাছ কেটে নৌকায় করে বাজারে নিয়ে যাওয়া এখন পদ্মা-পাগলা-মহানন্দা নদীর সাধারণ দৃশ্য। গাছ উজাড় হবার ফলে এই এলাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মরু প্রকৃতি সৃষ্টি হবার আশঙ্কা হয়েছে। গাছ না থাকায় বহু পশু-পাখি আশ্রয় ও খাদ্য হারিয়েছে। জেগে উঠা চরগুলোতে কবে গাছ লাগানো হবে- যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠা সবুজ প্রকৃতি ফিরে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মানুষ আর বৃক্ষের এই বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফারাক্কার কৃত্রিম বাঁধের কারণে এই ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি- একথা বিশেষজ্ঞ মহলের।

পিপিএম ট্রায়াঙ্গলের ধ্বংসযজ্ঞে সরকারী সাড়া মিলেছে সামান্যই

পিপিএম ট্রায়াঙ্গল তথা পদ্মা-পাগলা-মহানন্দা নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জেলার সর্বস্তরের মানুষকে রীতিমত আন্দোলন করতে হয়েছে। এই আন্দোলনের কারণে সরকারীভাবে যে সাড়া দেয়া হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য বলে জানা গেছে।

তিন নদীর বিধ্বংসী লীলা প্রতিরোধে যেখানে প্রয়োজন ছিলো ৬শ' কোটি টাকার প্রকল্প, সেখানে মাত্র ৮০ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এ বছর মাত্র ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ। সরকারী পর্যায়ে নদী ভাঙ্গনের এই ঘটনাকে বরাবর অত্যন্ত অবহেলার চোখে দেখা হয়। যে কারণে সময়মতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষতির ভয়াবহতা বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। কিন্তু হুমকির সম্মুখীন মানুষরা বসে থাকতে পারেনি। গত বছর পেশা, দলমত, সংগঠন-সংস্থা নির্বিশেষে একটি প্লাটফরমে সমবেত হয় নবাবগঞ্জ জেলার মানুষ। সে সময় গঠন করেছে 'নবাবগঞ্জ জেলা নদী ভাঙ্গন সংগ্রাম কমিটি'। ঢাকার নবাবগঞ্জ জেলা সমিতিও ছিলো সক্রিয়। এসব সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেও দিতে হয় স্মারকলিপি। মন্ত্রী ও পাউবো উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এতদসত্ত্বেও বিষয়টি সঠিকভাবে গুরুত্ব পায়নি রাজনৈতিক অবহেলার কারণে। পদ্মার ভাঙ্গন প্রতিরোধে সময়মতো ব্যবস্থা নিলে বর্তমান পরিস্থিতি অনেকাংশে এড়ানো যেতো বলে অভিজ্ঞমহল অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু এখন পদ্মা ও পাগলার স্রোত একাকার হবার ফলে দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। পদ্মার উজান থেকে পাগলার মুখ পর্যন্ত এবং পাগলা থেকে মহানন্দার মুখ পর্যন্ত ব্যাপক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য ব্যবস্থা কার্যকর হবে না। পাশাপাশি পাগলার মুখ থেকে মহানন্দা একেবারে গোদাগাড়ীতে পদ্মার সংযোগ পর্যন্ত সমন্বিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুবা বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম নিলে তা টিকে থাকতে পারবে না। বরং অর্থের অপচয় ঘটবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা অস্থায়ী

www.nagorikpathagar.com

পদক্ষেপ মাত্র। এর মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী উভয় কার্যক্রমই রয়েছে। স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পদ্মা নদীর খাড়া পাড় ঢালু করে কেটে জিও টেক্সটাইল ও বাঁশের পারকোপাইন দিয়ে ভাঙ্গন ঠেকানোর ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় পদ্মা নদীতে পাঁকা থেকে সুন্দরপুর পর্যন্ত ৮টি স্থানে ৮টি স্পার নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি স্পার হবে সিমেন্টের ব্লকের ও দেড়শ' মিটার দৈর্ঘ্যের। এ জন্য বরাদ্দ আছে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে চলতি বছর মাত্র ২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩০ কোটি টাকার টেন্ডার আহ্বান করছে। বাকীতে এই কাজ করা হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, দীর্ঘ মেয়াদী এসব কাজ মোটামুটি একই সময়ে বাস্তবায়ন করতে না পারলে বর্তমান প্রকল্পের সার্থকতা থাকবে কি না সন্দেহ আছে। তাছাড়া পাগলায় কোনো কার্যক্রম আদৌ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এই নদীর ভাঙ্গন থেকে বিস্তীর্ণ জনপদ রক্ষারও কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

অন্যদিকে গত এক যুগে মহানন্দা নদীর ভাঙ্গনে প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তলিয়ে গেছে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বেশক'টি জনপদ। এই ভাঙ্গনও রয়েছে অব্যাহত। রাজারামপুর, নামোনিমগাছী, দারিয়াপুর, হরিপুর, বালিয়াঘাটা প্রভৃতি গ্রাম এখনো মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভাঙ্গন রোধে দীর্ঘ মেয়াদী কোনো কার্যক্রম নেই। ভাঙ্গন জোরদার হবার মুখে শুধু কিছু অস্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। যা এ পর্যন্ত অপচয় খাতেই ব্যয় হয়েছে। জেলাবাসী এক্ষেত্রেও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী করে আসছেন।

(রচনাকাল ঃ নভেম্বর, ২০০০ ইং)

www.nagorikpathagar.com

উত্তরাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিবেশের হালচাল

দেড় কোটি মানুষ বহুবিধ রোগের কবলে
বিধিলিপি মেনে নিয়ে ভুগছে অনেকেই

উত্তরাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিবেশে চলছে এক চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এই অঞ্চলের প্রায় দেড় কোটি মানুষ কোন না কোন রোগের কবলে পতিত। অনেক রোগের সঠিক ডায়গনসিস হয়না। চিকিৎসার আধুনিক ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার নানা কথা শোনা গেলেও রাজশাহী বিভাগের মানুষ এর সার্বিক সুফল থেকে বঞ্চিত।

এই অঞ্চলের বহু শিশু, নারী ও পুরুষ চিকিৎসা না পেয়ে দিনের পর দিন শয্যাশায়ী থাকে। ফলে বিনষ্ট হয় প্রাণশক্তি ও কর্মক্ষমতা। অনেককে সঠিক চিকিৎসার অনুসন্ধানে হযরানির শিকার হতে হয়। রাজশাহী বিভাগের ১৬ টি জেলার একেকটিতে একেক রোগের প্রাধান্য রয়েছে। তবে দূষণজনিত আর্সেনিকোসিস, ডায়রিয়া, ত্বকের রোগ, গর্ভজনিত রোগ, অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা, দাঁত ও চোখের পীড়া অতি সাধারণ বিষয়। অন্য যেসব জটিল রোগ প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তার মধ্যে রয়েছে ক্যানসার, যক্ষা, কুষ্ঠ, আলসার, দূর্ঘটনাজনিত পঙ্গুত্ব, যৌনরোগ, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, গলগন্ড প্রভৃতি। এসব রোগের পেছনে জনসচেতনতার ঘাটতি কাজ করলেও দেশী - বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা পর্যায়ে তা প্রায় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে সীমিত আছে।

রোগ ও রোগীর ভীড়

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, রাজশাহী বিভাগের ১৬ টি জেলায় অভাবজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ মানুষ। রক্তশূন্যতার শিকার প্রায় সাড়ে ৮ লাখ মানুষ। পেপটিক আলসারে ভুগছে প্রায় ১০ লাখ এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগে ধুঁকছে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ। প্রতিবছর ডায়রিয়া ও আমাশয় জনিত রোগ হয় আড়াই লাখ থেকে সোয়া ৩ লাখ শিশু ও নারীসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষের। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয় ৩ হাজারের বেশি লোক। ফাইলেরিয়া রোগে ভুগছে প্রায় ২ হাজার। কুষ্ঠব্যাধির কবলে পড়েছে ৪০ হাজারের বেশি। গর্ভজনিত জটিলতায় ভুগছে প্রায় দেড় লক্ষ মহিলা। দাঁত, কান ও চোখের রোগে আক্রান্ত ১০ লাখ ৭০ হাজার এবং মানসিক চাপজনিত সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। সর্বশেষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭ লাখ।

এই অঞ্চলে আয়োডিন ঘাটতির কারণে গলগন্ড আক্রান্ত ও দৈহিক আকৃতি বামুনাকার ধারণ করেছে অন্তত ৪ লাখ মানুষ। আর বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন করে কত সংখ্যক মানুষ যে মানসিক পঙ্গুত্বের শিকার হচ্ছে, তার হিসেব এখনো কেউ করেনি। এছাড়াও সাম্প্রতিকতম এইচআইভি ভাইরাস বহনের মাত্রাও এই অঞ্চলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে

www.nagorikpathagar.com

উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে। নানাভাবে বিষক্রিয়ার কারণে অসুস্থ হয়েছে অন্ততঃ ২০ হাজার লোক। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়েছে প্রায় ৪ লাখ।

এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, রাতকানা, ধনুষ্টংকার, ডায়াবেটিস, হুপিংকাশি, গুটিবসন্ত প্রভৃতি রোগেরও বেশ প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মীদের সূত্রে জানা যায়। মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণের ঘটনা নিত্য শোনা গেলেও এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে অন্ততঃ ৪ লাখ মানুষ গলায় ঘ্যাগ বা গলগন্ড নিয়ে ঘুরছে এবং এদের আকৃতি বেঁটে হয়ে থাকছে। প্রধানতঃ রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, বগুড়া, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর, নওগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে এর প্রকোপ বেশী। শুধুমাত্র রংপুর জেলাতেই শতকরা ৩ ভাগ মানুষ আয়োডিন ঘাটতির শিকার বলে ইউনিসেফের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

সারাদেশে যে প্রায় ৮০ হাজার কুষ্ঠরোগী রয়েছে তার অর্ধেকের বেশি রয়েছে উত্তরাঞ্চলে। এর মধ্যে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর ও নীলফামারী জেলায় ৫ হাজার রোগী বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন যাবত ভুগছে ২৫ হাজার নারী পুরুষ ও শিশু। শুধুমাত্র ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়েই ১০ হাজার কুষ্ঠরোগী রয়েছে বলে জানা যায়। ডেনিশ-বাংলাদেশ লেপ্রসী মিশন দীর্ঘদিন ধরে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করে আসছে। এতে বেশ কিছু রোগী সুস্থ হলেও বেশীর ভাগই অসুস্থ হয়ে রয়েছে। এক তথ্যে দেখা যায়, উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুরের অধিকাংশ গ্রামের মানুষ ফাইলেরিয়া রোগে আক্রান্ত। বৃহত্তর দিনাজপুরের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ এবং বৃহত্তর রংপুরের প্রায় ৮ শতাংশ মানুষ এই রোগের শিকার।

পানি বাহিত রোগে এই অঞ্চলে প্রতিবছর মারা যাচ্ছে বহু সংখ্যক মানুষ। বিশুদ্ধ পানি পান ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা এর প্রধান কারণ বলে জানা যায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালে এই অঞ্চলে পানিবাহিত রোগে ১৭৭জন , '৯৭ সালে ২২৮ জন, '৯৮ সালে ৫৮১ জনের মৃত্যু ঘটে। '৯৯ সালে মারা যায় ১৩৭ জন। আক্রান্ত হয় ৩ লাখের বেশী মানুষ। ১৯৯৮ সালেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মানুষ।

এই অঞ্চলের আরেক ঘাতকব্যাধি ল্যাথারিজম। অভাব-অনটনে পড়ে বিষাক্ত ডালবীজের রুটি খেয়ে এই রোগের কবলে পড়ে পঙ্গুত্ববরণ করেছে অন্তত ১৬ হাজার মানুষ। নানা সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের ফলে এর বিস্তার হ্রাস পেলেও পঙ্গুত্বের শিকার ব্যক্তিরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

বিশেষজ্ঞের মতামত

দেশের বিশিষ্ট একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ রাজশাহী ও মোমেনশাহী মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ সফিউর রহমান বলেন, এই অঞ্চলে হাঁপানী, ডায়রিয়া, হাবাগোবা

www.nagorikpathagar.com

হওয়ার শিকার প্রধানতঃ শিশুরা। এটা তার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে। অবশ্য সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে তূলনা করা গেলে প্রকৃত পরিস্থিতি জানা যাবে। তিনি জানান, প্রাকৃতিকভাবে খাবারে আয়োডিন কম থাকার কারণে এর ঘাটতি মানব শরীরে দেখা যাচ্ছে। সামুদ্রিক মাছ দিয়ে এটা পূরণ করা যায়। এছাড়া ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগ প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা ও রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে প্রকোপ বেশী। পুকুর ও বদ্ধজলাশয়ের পানি ব্যবহারের প্রবণতা এর অন্যতম কারণ। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ও অসম তাপমাত্রাও কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দেখা দেয় বলে তিনি মনে করেন।

সঠিক ডায়গনসিস না করে চালিয়ে দেয়া হয়
কথিত অজ্ঞাত ও অভাব জনিত রোগী ৪০ লাখ

দেশে বিগত বছরগুলোতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি ও অগ্রগতির দাবী করা হলেও উত্তরাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ এখনো 'অজ্ঞাত' রোগের কবলে। সঠিকভাগে রোগ চিহ্নিত করতে না পারার কারণে এসব রোগী ধুঁকে ধুঁকে দিন যাপনের ভাগ্যলিপি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এদেরকে 'অভাবজনিত' কিংবা 'অন্যান্য' তালিকাভুক্ত করে দায় এড়ানোর প্রবণতা চলছে।

রাজশাহী বিভাগের ১৬ টি জেলার অন্তত ৩০ লাখ মানুষ কথিত এই 'অজ্ঞাত' ও 'অভাবজনিত' রোগে ভুগছে। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিসংখ্যানে দেখা যায় সর্বাধিক সাড়ে ৭ লাখ মানুষ সিরাজগঞ্জ জেলায় এই দুটি পরিস্থিতির কবলে পড়েছে। অন্যান্য জেলার মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলায় রয়েছে সোয়া ৩ লাখ, পাবনায় আড়াই লাখ, বগুড়ায় প্রায় ২ লাখ, দিনাজপুরে প্রায় ২ লাখ, ঠাকুরগাঁওয়ে পৌনে ২ লাখ, রংপুর জেলায় আড়াই লাখ, নীলফামারীতে প্রায় দেড় লাখ, পঞ্চগড়ে প্রায় সোয়া ১ লাখ, রাজশাহীতে প্রায় পৌনে ২ লাখ, জয়পুরহাটে প্রায় সোয়া ১ লাখ, লালমনিরহাটে প্রায় ১ লাখ এবং নওগাঁ জেলায় রয়েছে ১ লাখ মানুষ।

অভাবজনিত কারণ

অভাবজনিত কারণ হিসেবে চিহ্নিত রোগীদের প্রকৃতপক্ষে সঠিক ডায়গনসিস করা যায়নি। এভাবে অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত চিকিৎসা চালানো হয়ে থাকে। এমন অভাব জনিত কারণে রোগীর সংখ্যার শীর্ষে রয়েছে রাজশাহী জেলা। এখানে এই রোগীর সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। এছাড়া সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এই রোগী দেখানো হয়ে থাকে।

সূত্রে প্রকাশ, প্রধানতঃ চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই কিংবা রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে এ ধরনের রোগের উল্লেখ করে দায়িত্ব সারেন। এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্লিনিকগুলোতে এভাবেই চলে পরিসংখ্যান।

www.nagorikpathagar.com

স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে প্রকাশ, এসব রোগীদের প্রকৃত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয় না। চিকিৎসক কোন রকমে রোগী বিদায় করে বাঁচেন। এদের বেশীর ভাগই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। যাদের পক্ষে রোগ নির্ণয়ে উচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে চিকিৎসকের আনুমানিক ব্যবস্থাপত্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

আবার কোন কোন সময় পরিসংখ্যান তৈরীতে ত্রুটি থাকে বলে স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্র স্বীকার করে। রোগের কারণ পৃথক পৃথক বর্ণনা না দিয়ে ঢালাওভাবে 'অন্যান্য' বলে উল্লেখ করা হয়। এতে স্বাস্থ্য তথ্য বিভ্রাটের পাশাপাশি পরিস্থিতি নির্ণয়েও সমস্যা হয়।

'অন্যান্য' রোগ

স্বাস্থ্য বিভাগের পরিসংখ্যানে 'অন্যান্য' রোগীর তালিকায় রয়েছে প্রায় ২৪ লাখ মানুষ। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জে রয়েছে প্রায় ৭ লাখ। এছাড়া কুড়িগ্রামে প্রায় ৩ লাখ, গাইবান্ধায় ২ লাখের বেশী, রংপুরে প্রায় ২ লাখ, ঠাকুরগাঁয়ে দেড় লাখ, দিনাজপুরে ১ লাখ ২৫ হাজার, বগুড়ায় প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার, পাবনায় প্রায় ১ লাখ,লালমনিরহাটে ৭০ হাজার, নীলফামারীতে ১ লাখের বেশী, পঞ্চগড়ে প্রায় ৪৫ হাজার এবং জয়পুরহাটে রয়েছে ১ লাখের বেশী।

পেপটিক আলসার

উত্তরাঞ্চলের ১৬ টি জেলায় অন্ত্রের রোগ এক ভয়াবহ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এই অঞ্চলে প্রায় ১ লাখ মানুষ 'পেপটিক আলসার' রোগে ভুগছে বলে জানা গেছে। অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া, ভেজাল খাদ্য ও বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ এর প্রধান কারণ বলে জানা গেছে। রাজশাহী জেলায় সর্বাধিক ১ লাখের বেশী মানুষ পেপটিক আলসারে ভুগছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়। এছাড়া কুড়িগ্রামে ৮৭ হাজার, দিনাজপুরে ৮৩ হাজার, নাটোরে ৮০ হাজার, নওগাঁয় ৭৬ হাজার, পাবনায় ৭২ হাজার, লালমনিরহাটে প্রায় ৫০ হাজার, রংপুরে ৭০ হাজার, গাইবান্ধায় ৬২ হাজার, নীলফামারীতে ৩৭ হাজার, পঞ্চগড়ে ৪০ হাজার, ঠাকুরগাঁয়ে ৪০ হাজার, বগুড়ায় প্রায় ৫০ হাজার, জয়পুরহাটে ৩৭ হাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৫৫ হাজার এবং সিরাজগঞ্জে ১২ হাজার পেপটিক আলসারের রোগী আছে।

রক্তশূন্যতা

উত্তরাঞ্চলে 'রক্তশূন্যতা' রোগের মাত্রা অত্যন্ত বেশী বলে জানা গেছে। প্রধানতঃ মহিলারা এর শিকার বেশী। প্রায় ৭ লাখ রোগী রয়েছে রক্তশূন্যতার। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সিরাজগঞ্জে ৯৩ হাজারের বেশী, রাজশাহীতে প্রায় ৮৫ হাজার, দিনাজপুরে ৬৬ হাজার, রংপুরে প্রায় ৬৪ হাজার, নাটোরে ৫৫ হাজার, নওগাঁয় ৪৩ হাজার, নবাবগঞ্জে ২০ হাজার,

www.nagorikpathagar.com

পাবনায় প্রায় ৪৭ হাজার, পঞ্চগড়ে ২৫ হাজার, গাইবান্ধায় ২২ হাজার, নীলফামারীতে ২৬ হাজার, লালমনিরহাটে ২৫ হাজার এবং কুড়িগ্রামে ৪২ হাজার রক্তশূন্যতার রোগী পাওয়া গেছে।

এছাড়া হাঁপানী বা এ্যাজমা রোগও বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এই অঞ্চলে। প্রায় দেড় লাখ অ্যাজমা রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত। এর মধ্যে সর্বাধিক সিরাজগঞ্জে ২৩ হাজারের বেশী, বগুড়ায় ১৫ হাজারের বেশী, রংপুর ও গাইবান্ধায় প্রতিটিতে ১৩ হাজারের বেশী এবং কুড়িগ্রামে প্রায় ১৩ হাজার রোগী রয়েছে। অন্যান্য জেলাতেও এ সংখ্যা বেশ উদ্বেগজনক।

আর্সেনিকের বিস্তার

আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় ৬ লাখ মানুষ নানা রোগের মুখে পড়েছে। এসব উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ডারমাটাইটিস, মিউরোপ্যাথি, হেপটোপ্যাথি, মেনালোসিস, ডিপিমেনটেশন, হাইপার ফেরাটোসিস, কংজাংটিভাইটিস, ব্রংকাইটিস, গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিস প্রভৃতি। যথাসময়ে চিকিৎসা না নিলে এ থেকে শেষ পর্যন্ত গ্যাংগ্রিন ও ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে বলে বিশেষজ্ঞদের সুত্রে প্রকাশ।

এছাড়া হেপাটাইটিস বা জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ সম্পর্কে তেমন জরিপ না হওয়ায় সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায়নি। উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে এইচআইভি ভাইরাস থেকে এইডস-এর প্রাদূর্ভাব বৃদ্ধির আশংকাও করা হচ্ছে। ডায়াবেটিকরোগের মাত্রাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বলে হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর সুত্রে জানা গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, কলেরা, হাঁপানী ও দূষিত বায়ুজনিত পীড়ার প্রধান শিকার শিশুরা। ম্যালেরিয়া, শ্বাসকষ্ট ও পেটের পীড়ায় প্রতি ৫ জন শিশুর একজন প্রতিবছর বয়স পাঁচ বছর হবার আগেই মারা যায়। উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁর আবহাওয়ার অসম আচরণ যেমন-অতি খরা, অতি বর্ষণ, অতিমাত্রায় শীত প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের কারণ হিসেবে দেখা যায়। বগুড়া অঞ্চলে শিল্প দূষণ, রংপুর অঞ্চলে তামাকের বিভিন্ন প্রক্রিয়া শ্বাসকষ্টজনিত রোগ বৃদ্ধি করে।

বিশেষজ্ঞ মতামত

উত্তরাঞ্চলে অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা, এ্যাজমা প্রভৃতি রোগের বিস্তার সম্পর্কে ঢাকার শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ আবদুল জলিল চৌধুরী জানান, হাঁপানী বা এ্যাজমা সাধারণতঃ 'মাইট' জাতীয় ছত্রাক জীবাণুর কারণে

www.nagorikpathagar.com

ছড়ায়। এ্যালার্জি আক্রান্তরা বেশী এর শিকার হয়। শীতে এর প্রকোপ বাড়ে। রক্তস্বল্পতা হয় প্রধানতঃ লোহাজাত উপাদানের অভাবে। অপুষ্টিও হয় সুষম খাবারের অভাবে। এই অঞ্চলে এসব রোগের মাত্রা বেশী কিনা সে সম্পর্কে তিনি কোন তুলনামূলক রিপোর্ট দেখেননি বলে জানান।

চিকিৎসক ও ওষুধের সংকট মারাত্মক
৪ কোটি মানুষের চিকিৎসা চাহিদা পূরণ হয়না

উত্তরাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এখনো রয়েছে প্রচুর ঘাটতি ও সমস্যা। অবকাঠামোগত দিক থেকে কিছুটা অগ্রগতি হলেও অভ্যন্তরীণ সংকট রয়েছে মারাত্মক আকারে। চিকিৎসক ও ওষুধ ঘাটতি জর্জরিত রেখেছে পুরো স্বাস্থ্য বিভাগকে। যা ৪ কোটি মানুষের চিকিৎসা চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে।

যথাযথ চিকিৎসার অভাবে বহু মানুষ নিত্যদিন ছুটে যাচ্ছে ভারতে উন্নত চিকিৎসার আশায়। অনেকেই হচ্ছে প্রতারিত। ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ বাজার দখল করে রয়েছে। অবৈধ ক্লিনিক ও প্যাথোলজি ব্যবসায় প্রতারিত হচ্ছে রোগীরা। অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছে মানুষ। হাসপাতাল - ক্লিনিকগুলোতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও ওষুধের অভাব। দূর্নীতি, অনিয়ম, প্রতারণা প্রভৃতি কারণে একশ্রেণীর লোকের পকেট ভারী হলেও সর্বশান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। সঠিক চিকিৎসার পরিবর্তে রোগ নিয়ে চলছে নির্মম খেলা।

পরিসংখ্যান

রাজশাহী বিভাগে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে ৪টি। এগুলো হলো রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর। বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ৪টি। এগুলো রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও রংপুরে অবস্থিত। বক্ষব্যাধি ক্লিনিক ১১টি। ৫০ ও ১০০ শয্যার হাসপাতাল মোট ১৩টি। ৩১শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১০৯টি। ১০শয্যার পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩টি। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩৯২টি। এছাড়া কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ১টি, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৬টি, আরবান ডিসপেনসারী ৪টি, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল ১টি এবং মানসিক হাসপাতাল রয়েছে ১টি। সীমিত চিকিৎসার সুবিধা সম্বলিত চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে পুলিশ একাডেমী ১টি, পুলিশ লাইন ৫টি, জেল হাসপাতাল ৫টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টার ১টি। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে।

শূন্যতার সংকট

রাজশাহী বিভাগের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসকের পাশাপাশি চিকিৎসা সহযোগী অন্যান্য পদগুলোও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। সাড়ে ৫শ'র বেশী চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য

www.nagorikpathagar.com

চিকিৎসকের মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা প্রায় ১৬শ'। এর মধ্যে সাড়ে ৭শ'র বেশী পদ শূন্য। এর মধ্যে চিকিৎসা কাজে সর্বাধিক সক্রিয় সহকারী সার্জন ও মেডিকেল অফিসারের শূন্য পদের সংখ্যা প্রায় ৫শ'টি। ৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩৯টি চিকিৎসক পদ শূন্য। রাজশাহী জেলায় ১শ' ৩৬ টি চিকিৎসক পদের মধ্যে শূন্য ৪৮টি। দিনাজপুর জেলায় এই পদে ৫৮ জন ঘাটতি রয়েছে। নওগাঁ জেলায় শূন্য পদ ৭৫টি। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা - কর্মচারীর বহু সংখ্যক পদও রয়েছে শূন্য। রাজশাহী জেলায় এরকম ১৮৪ টি পদ শূন্য রয়েছে। এভাবে অন্যান্য জেলায় এ পদগুলোর বহু সংখ্যক শূন্য রয়েছে বলে জানা গেছে।

সমস্যা জর্জরিত

উত্তরাঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে বর্তমান শয্যা সংখ্যা চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে ৫শ' বেড রয়েছে। একে একহাজারে উন্নীত করার পরিকল্পনা বহুদিনের। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

এখানে ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ রোগীকে মেঝেতে - বারান্দায় নানাভাবে রাখা হয়। ফলে চিকিৎসা কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এই হাসপাতালে স্নায়ু রোগীদের ভীড় বাড়লেও মাত্র ৩৫টি বেড থাকায় এবং যথেষ্টসংখ্যক চিকিৎসক না থাকায় হিমশিম খেতে হয় কর্তৃপক্ষকে।

এই অঞ্চলে ৩৯২টি সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৯০টিতে রয়েছে এক্সরে মেশিন। এর মধ্যে চালু আছে ৪৮টি। বাকীগুলো অকেজো। অচল হয়ে আছে ৫৯টি এ্যাম্বুলেন্স । রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৫টির মধ্যে ৪টি এ্যাম্বুলেন্সই অচল দীর্ঘদিন ধরে। নওগাঁর একমাত্র এ্যাম্বুলেন্সও কোন কাজে আসছে না। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে প্রায়ই ওষুধের সংকট লেগে আছে। আবার সরকারী ওষুধ দিব্যি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

অবৈধ ব্যবসা

উত্তরাঞ্চলে সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে বহুসংখ্যক ক্লিনিক ও প্যাথলোজিক্যাল ল্যাবরেটরী। এই সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বলে একটি তথ্যে জানা গেছে। এগুলোর বেশীরভাগেরই সরকারী অনুমোদন নেই। ফলে যাচ্ছেতাই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে তারা। লাইসেন্সবিহীন অনেক ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরীতে রয়েছে চরম অব্যবস্থা আর প্রতারণার রকমারী স্টাইল। রয়েছে গ্রাহকদের সাথে দূর্ব্যবহার ও অবহেলার অভিযোগ। এগুলোর সঙ্গে সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের একশ্রেণীর চিকিৎসকের ব্যবসায়ীক সম্পর্ক থাকায় তারা দিব্যি এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যবহৃত এক্সরে ফিল্ম, সিরিঞ্জ পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলোতে। গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ডিসপজেবল সিরিঞ্জ নিয়ে। সূত্রে প্রকাশ, সরকারী - বেসরকারী হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলোতে মাসে প্রায় ৩ লাখ সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.com

এসব সিরিঞ্জের একটি বড় অংশ একবার ব্যবহারের পর বিনষ্ট করার পরিবর্তে দালালদের মাধ্যমে হাত বদল হয়ে প্যাকেটযুক্ত করে পুনরায় ব্যবহারের জন্য ক্লিনিকে আসে। এ নিয়ে চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহকারী ঠিকাদারদের একটি চক্রের যোগসাজশের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর এ নিয়ে ওষুধ বাজারে রীতিমত জমজমাট কারবারও চলতে থাকে। অন্যদিকে নকল ও ভেজাল ওষুধের দাপট এই অঞ্চলে ব্যাপক। বিশেষ করে ভারত থেকে এসব নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ অসাধু ব্যবসায়ীরা আমদানি করে থাকে। দেশী কোন কোন কোম্পানীও এ ধরনের ওষুধ প্রস্তুত ও বাজারজাত করে বলে অভিযোগ আছে।

ভারতমুখী রোগীরা

জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার যথেষ্ট সুযোগ না থাকা এবং স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা ব্যয়বহুল হবার কারণে উত্তরাঞ্চলের বহু রোগী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে যায় চিকিৎসা নিতে।এর ফলে দেশী চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি যেমন অনাস্থা প্রকাশ পায়, তেমনি বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা বিনষ্ট হয়। সেই সাথে ভারত থেকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ -ব্যাধি কেউ কেউ সঙ্গে করে নিয়ে আসে। রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থাকলেও বিশেষ করে হৃদরোগ ও ক্যান্সারসহ জটিল রোগের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা সুবিধা নেই। অনেকেই কিডনী, জন্ডিস, পিত্তথলির পাথর অপসারনসহ বিভিন্ন চিকিৎসার জন্যও ভারতমুখী হচ্ছে। ঢাকায় কিছু ব্যবস্থা থাকলেও যে পরিমাণ ব্যয় হয় তার থেকে সামান্য কিছু বেশী ব্যয় করলেই ভারতে উন্নত চিকিৎসার আশা করছে অনেকেই। বিশেষ করে ডায়াগনষ্টিক সেন্টারগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপক হেরফের ও অনির্ভরতায় হতাশ হয় রোগীরা। ভারতীয় চিকিৎসকরা কমসংখ্যক পরীক্ষায় এবং স্বল্পসময়ে নির্ভরযোগ্য রিপোর্টসহ ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন বলে রোগীদের মধ্যে প্রচার আছে। এই অঞ্চলের সীমান্তের পাশেই ভারতীয় শহরগুলোতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্র্যাকটিস করে থাকেন। আর তারা আকৃষ্ট করেন বাংলাদেশী রোগীদের। তাছাড়া ভারতে স্পেশালাইজড ক্লিনিক আছে। হৃদরোগ, কিডনী প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো এই ধারণা গড়ে ওঠেনি। সেখানে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষায় থাকতে হয় না। সেখানকার এই ইতিবাচক দিকগুলো বাংলাদেশের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো রপ্ত না করে রোগীদের সেদিকেই ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

স্বাস্থ্য বিভাগের ভাষ্য

রাজশাহী বিভাগের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ অঞ্চলে বর্তমানে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড কিংবা জনশক্তির ঘাটতি পূরণে উদ্যোগের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন কিছু জানেনা। এখানকার সহকারী পরিচালক ডা. মতিয়ার রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সংবাদপত্র থেকে জানা গেছে যে, শীঘ্রই নতুন ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ করা হবে। তবে স্থানীয়ভাবে সিভিল সার্জন অফিসের মাধ্যমে নিয়োগগুলোও বন্ধ আছে। স্বাস্থ্য বিভাগীয় নয়া অবকাঠামো নির্মাণ

www.nagorikpathagar.com

বা কোন সম্প্রসারণ প্রকল্প বর্তমানে নেই। কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ প্রকল্পও বন্ধ রয়েছে বলে তিনি জানান। নতুন এ্যাম্বুলেন্স ও এক্সরে যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পর্কেও তিনি কোন তথ্য জানেন না।

৭০ ভাগ মানুষই দূষিত পানির উপর নির্ভরশীল
মাত্র ৩৭ ভাগ বাড়িতে আছে স্যানিটারী ল্যাট্রিন

উত্তরাঞ্চলের পরিবেশগত সংকটের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে, এর মধ্যে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি সর্বাধিক বলে জানা গেছে। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে দূষিত পানির ব্যবহার, স্যানিটেশন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি না হওয়া, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়কে। আয়োডিন ঘাটতিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণ হয়ে রয়েছে।

বিভিন্ন সংস্থা তাদের জরিপ ও গবেষণা কর্মের মাধ্যমে এসব বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করলেও এর প্রতিকার বা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ খুবই সীমিত। বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে আন্ত র্জাতিকভাবে হৈচৈ করা না হলে এসব বিষয়গুলো স্থানীয়ভাবে তেমন গুরুত্ব পায় না। অথচ এসব চিহ্নিত সমস্যাগুলো এখানকার জনস্বাস্থ্যকে দিনের পর দিন পঙ্গু করে রাখছে, নিঃশেষ করে চলেছে জীবনীশক্তি।

পানি দূষণ

এই অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানির দূষণ ঘটেছে পানির প্রবাহকে বাধগ্রস্ত করে। পদ্মা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ এর অন্যতম উদাহরণ। এছাড়া, অসংখ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ প্রকল্প নির্মাণের কারণে প্রবহমান জলধারা স্তব্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে জলাশয়গুলো বদ্ধ হয়ে পানি দূষিত হয়েছে। এছাড়া, আবাদী জমিতে ফসলের ফলন বৃদ্ধি ও কীট পতঙ্গ দমনে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিষ ছড়ানো হয়েছে। মানুষ নানা কাজে এই পানি ব্যবহার করায় স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। এক দীর্ঘমেয়াদী দূষণের প্রতিক্রিয়ার কবলে পড়েছে জনস্বাস্থ্য।

অন্যদিকে, ভূ-গর্ভের পানি দূষিত হয়েছে মাত্রার চেয়ে অধিক আর্সেনিক, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, চুন প্রভৃতি পদার্থ জমার ফলে। বিশেষ করে আর্সেনিকের মাত্রা ব্যাপক বেড়ে যাবার ফলে অন্ততঃ সাড়ে ৬ লাখ মানুষ বিষক্রিয়ার কবলে পড়েছে। একটি জরিপ থেকে জানা যায়, ১৬টি জেলার এক কোটির বেশী সংখ্যক মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানির নাগাল পায় না। বগুড়া, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও ধরলার চরের মানুষ প্রধানতঃ এই পানি থেকে বঞ্চিত। এই অঞ্চলের গ্রাম পর্যায়ে হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা ৩ লাখ ২৫ হাজার। এসব নলকূপ থেকে শতকরা ৪০

www.nagorikpathagar.com

ভাগেরও কম মানুষ পানি সরবরাহ পেয়ে থাকে। এই সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে আর্সেনিক সমস্যা দেখা দেয়ায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ বিপাকে পড়ে। তারা এসব হস্তচালিত নলকূপ পুনঃস্থাপন এবং তারাপাম্প স্থাপনের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনাও নেয়। কিন্তু অর্থাভাবে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় সাম্প্রতিককালে প্রায় সাড়ে ৮শ' তারাপাম্প ও প্রায় ১২শ' অগভীর নলকূপ পুনস্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়। কিন্তু অর্থাভাবে এটি পুরোদমে এগুচ্ছে না বলে জানা গেছে। এই অর্থাভাব এবং প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে জনসচেতনতা গড়ে না উঠায় পরিস্থিতির কার্যকর উন্নতি হচ্ছে না।

স্যানিটেশনের দুর্বল যাত্রা

উত্তরাঞ্চলের স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন তথা স্যানিটেশন ব্যবস্থার অগ্রগতি খুবই সামান্য বলে ইউনিসেফ রিপোর্ট থেকে জানা যায়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ ও বিশ্বসংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসম্মত এই ব্যবস্থা আজও সন্তোষজনক দূরের কথা উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। ১৬টি জেলার গড় হিসেবে এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৭ ভাগ বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করা হয়। ইউনিসেফ রিপোর্ট মতে, জয়পুরহাট জেলার মাত্র ১৮ ভাগ বাড়ীতে, নীলফামারীতে ২১ ভাগ, দিনাজপুরে ২২ ভাগ, গাইবান্ধায় ২৩ ভাগ, রংপুরে ২৬ ভাগ, পঞ্চগড়ে ২৮ ভাগ বাড়িতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, পাবনায় ৩৩ ভাগ, সিরাজগঞ্জে ৩৬ ভাগ, লালমনিরহাটে ৪০ ভাগ, নাটোরে ৪০, কুড়িগ্রামে ৪২ ভাগ, বগুড়ায় ৪৮ ভাগ, নবাবগঞ্জে ৪৯ ভাগ এবং রাজশাহী জেলায় ৪৯ ভাগ বাড়িতে এই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহৃত হয়।

বাকী গড়ে ৬৩ ভাগ বাড়িতেই ব্যবহৃত হয় কাঁচা ও আধাপাকা ল্যাট্রিন। এর একটা বড় অংশ উন্মুক্ত স্থানেও প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে

যেখান থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠার কথা সেই শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতেও স্বাস্থ্যসম্মত পানি ও ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা আজও করা যায়নি। তথ্যে প্রকাশ, উত্তরাঞ্চলের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪২ লাখ শিক্ষার্থী অস্বাস্থ্যকর উৎস থেকে পানি পান করে এবং যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার জরিপে দেখা যায়, এ অঞ্চলের প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজার ২৩৯ টি। এর মধ্যে প্রায় ১৫ হাজারেই নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ২৭ হাজার নলকূপের মধ্যে ২৫হাজারের আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়নি। প্রায় ১২ হাজার পায়খানার মধ্যে মাত্র দেড়

www.nagorikpathagar.com

হাজার মানসম্মত। প্রায় ৬ হাজার প্রতিষ্ঠানে কোন রকমে এ পায়খানার ব্যবস্থা আছে। বাকীগুলোর কোন ব্যবস্থা আদৌ নেই।

খাবার পানির দূষণ পরিস্থিতি

বিশেষতঃ নগর -শহর এলাকায় খাবার পানি দৃশ্যতঃ বিশুদ্ধ মনে হলেও গবেষণায় তা মারাত্মক দূষণযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জলাশয়তত্ত্ব বিভাগের এক গবেষণায় দেখা যায় ,আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য মাত্রার ক্ষেত্রে পানির বিদ্যুৎ পরিবাহিতার (Conductivity) পরিমাণ ৩শ' ইউনিট ছাড়িয়ে কোথাও কোথাও ২ হাজার ৫শ' ইউনিটে পৌঁছেছে। রাসায়নিক অক্সিজেনের (Cod) পরিমাণ যেখানে ১০ ইউনিট পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য, সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ৮ শতাধিক ইউনিট পর্যন্ত পাওয়া গেছে। আর জীবগত অক্সিজেনের (Bod) পরিমাণ ০.৫ থেকে ১.০ পর্যন্ত গ্রহণীয় হলেও পাওয়া গেছে ৩.২ পর্যন্ত। দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা সর্বনিম্ন ৪ থেকে ৬ ইউনিট পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এ মাত্রা কমে গিয়ে ২.০ থেকে ১.৬ ইউনিটে নেমে এসেছে। ফলে পানি দ্রুত পচে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলে। এছাড়া, লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আন্তর্জাতিক মাত্রার চেয়ে বেশী বলে পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। এই পানি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হলেও নগরীর মানুষ তা ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে বলে গবেষকরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

একই স্থানে দেশে 'খনিজ' ও 'বিশুদ্ধ' বলে বাজারজাতকৃত বোতলের পানি পরীক্ষা করেও দূষণ ধরা পড়েছে।

দেশের ৫টি স্থান থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায় পানির প্রাপ্ত ভৌত রসায়নমান ও বোতলের লেবেলে মানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এসব বোতলের পানিতে বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের মান নিম্ন, উচ্চ ক্লোরাইডমান ও উচ্চ জীবগত অক্সিজেন চাহিদা দূষণের সূচক।

এই পরিস্থিতি কেন?

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবহারের এই দুর্গতি প্রসঙ্গে আলাপ হয় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. রিজভী সুলতানের সঙ্গে। তিনি বলেন, যারা স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করেনা তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই দরিদ্র মানুষ। এদের ইচ্ছা থাকলেও পাকা পায়খানা স্থাপনের মত নিজস্ব জায়গা নেই। এক্ষেত্রে বস্তি ও নদীর পাড়ের লোকদের সমস্যা বেশী। তিনি গ্রামে সরকারী নলকূপ বসানোর মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনেও সহায়তা করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। সচেতনতা কর্মসূচীর সঙ্গে বাস্তব সহায়তাও দেওয়া দরকার বলে ডা. রিজভী মনে করেন।

www.nagorikpathagar.com

ভেজাল খাদ্য কীটনাশক রাসায়নিক সার
মাদকদ্রব্য স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটাচ্ছে

উত্তরাঞ্চলে স্বাস্থ্য -পরিবেশে সমস্যা তৈরীর পেছনে ভেজাল খাদ্য, বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার, আয়োডিনবিহীন খাবার, স্পিরিটসহ মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রসার, ইঁদুর, তেলাপোকা, ছারপোকা নিধনকারী বিষটোপের ছড়াছড়ি প্রভৃতি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

এই অঞ্চলের খাদ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানাগুলোতে যেমন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নেই, তেমনি নেই হোটেল রেষ্টুরেন্টে কোন স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চলে সেমাই, কনফেকশনারী এবং শিশুদের উপযোগী মনোরঞ্জক খাবার তৈরীর (যেমন- চকলেট, কুলপিবরফ) কারখানাগুলোতে পরিচ্ছন্নতার তেমন ধার -ধারে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রংও ব্যবহার করা হয়। গুড় তৈরীর জন্য ক্ষতিকারক 'হাইড্রোজ' ব্যবহার ওপেন সিক্রেট। মুড়ি তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হয় ইউরিয়া। এতে মুড়ি সাদা ও বড় বড় হয়। যা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ইউরিয়া পেটে গেলে কিডনী সমস্যা, রক্তশূন্যতা,ফুসফুস ও হৃৎপিন্ডে পানি জমা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, পাকস্থলি, যকৃত ও চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ, মাথা ব্যাথা, চর্মরোগ, অরুচি প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। চোরাপথে ভারত থেকে আসা লবণও মারাত্মক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটাচ্ছে বলে জানা গেছে। মূলত চামড়া সংরক্ষণের জন্য এই লবণে রাসায়নিক সার মেশানো হয়। আর তাই শহরে- গ্রামে ফেরী করে বিক্রি করা হয়। এতে আয়োডিনও নেই। ফল যা হবার তাই হচ্ছে। সস্তায় পেয়ে গ্রামের মানুষ ক্ষতিকর এই লবণ দেদারসে ক্রয় করে চলেছে। অন্যদিকে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে তামাকের ফ্যাক্টরীগুলোও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে চলেছে। এ ছাড়া, একই অঞ্চলে বিষাক্ত কীটনাশক মিশ্রিত শুটকি মাছ বাজারজাত করা হয়। এই শুটকি জনপ্রিয় হলেও মূলত ক্ষতিকারক স্বাস্থ্যের জন্য। ভারতীয় চিনিতেও মারাত্মক রাসায়নিক মেশানো থাকে বলে খবরে প্রকাশ।

জমিতে কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার এবং রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহার ফসলকে করছে বিষযুক্ত। বিশেষ করে শাক-সবজি উৎপাদনে এর ব্যবহারে কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করা হয় না। নিষিদ্ধ মেটাসিটোথাস, মিথাইল,

প্যারাথিয়ন ও ফসমিডনের ব্যবহার চলছেই। এসব কীটনাশক আবার বৃষ্টির পানির সঙ্গে জলাশয়কে দূষিত করছে। এর প্রভাব পড়ছে মাছ ও পানি ব্যবহারকারী লোকদের জীবনযাত্রায়। গ্রামের অনেক স্থানেই এই পানিতে গোসল ছাড়াও খাবার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কীটনাশক ছড়ানো জমির ফল-ফসল খেয়ে নানাবিধ রোগব্যাধি ছড়াচ্ছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে তরিতরকারী ভালভাবে ধুয়ে রান্না করার পরও কীটনাশকের কিছু কিছু উপাদানের ক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়না। যা মানুষের হৃদযন্ত্র ও লিভারের প্রদাহের কারণ হয়। গর্ভবতী মহিলাদের পেটের সন্তানও আক্রান্ত হয় এতে। এমনকি কীটনাশক ব্যবহৃত

www.nagorikpathagar.com

জমির খড় খাওয়া গরু-ছাগলের দুধেও বিষক্রিয়া সংক্রমিত হতে পারে। অন্যদিকে, উকুন, মশা, ছারপোকা, তেলাপোকা, ইঁদুর প্রভৃতি ক্ষতিকারক প্রাণী নিধনের নামে যে বিষ ও বিষটোপের আমদানি ও ব্যবহার করা হয় এগুলোতেও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। বোতল, কৌটা, প্যাকেট ও পুরিয়া আকারে প্রকাশ্যে এসব ফেরী করা হয়। ঘরে রাখলেও যা বিষক্রিয়া ছড়ায়। শিশুদের নাগালের মধ্যে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটায়। এসব বিষের রয়েছে তীব্র ক্রিয়া। যা মানব দেহে স্পর্শ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া করে।

মাদকের ছোবল

উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ সীমান্ত পথ দিয়ে নিত্যদিন চোরাচালান হয়ে আসছে রকমারী মাদক নামক বিষ। হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা ছাড়াও আসছে টিডিজেসিকসহ নানা প্রকারের ইনজেকশন। এসব মাদকদ্রব্য বেকার যুবক-তরুণ ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের আসক্ত করছে। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে ফেনসিডিল নামক মাদকদ্রব্য এক বিরাট জনসমাজকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। হেরোইনের বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত যুবক পুরো পরিবারের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনছে। অনেক অভিভাবক বাধ্য হয়ে সন্তানকে কারা হেফাজতে পাঠিয়ে দিচ্ছে সংশোধনের আশায়। এসব মাদকাসক্ত লোক দিনে দিনে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রোগী বৃদ্ধির তালিকায় নাম যোগ হচ্ছে নিত্যদিন।

ভারত থেকে এ ছাড়াও আসছে জীবন ধ্বংসকারী বিভিন্ন প্রকার ওষুধ। নাম পরিচয়হীন এসব ওষুধের আকর্ষণীয় লেবেল লাগিয়ে জীবন রক্ষাকারী নামে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। চোরাইপথে আসা এসব ওষুধের মধ্যে আছে ভেরজিন ইনজেকশন, ভেরালগান ট্যাবলেট, নউরোরিয়ান ইনজেকশন, এটিএস, ভেরোমিন, হেমোগ্লোবিন ভিজিক্স, পেটের বাচ্চা নষ্ট করার জন্য কমোবেট ভুগানাইন প্রভৃতি। গ্রাম পর্যায়ে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত লোকদেরকে হাতুড়ে ডাক্তাররা এসব ওষুধের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। এক শ্রেণীর ফার্মেসী মালিক জেনে শুনে বেশী লাভের আশায় এসব ওষুধ দিব্যি চালিয়ে দিচ্ছে। এদের একটা চক্র ও নেটওয়ার্ক আছে বলে জানা যায়। এসব ওষুধ নামের বিষ জনস্বাস্থ্য করছে বিপর্যস্ত।

এই অঞ্চলের হোটেল-রেষ্টুরেন্টগুলোতে বাসি-পচা ও ভেজাল খাবার পরিবেশনও এক স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ভেজাল মসলা ও তেলের ব্যবহার এবং হোটেলের চারদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সার্বিক পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছে। এসব বিষয় দেখার মত কোন সংস্থা নেই বলেই মনে হয়। মোটরযানের হাইড্রোলিক হর্ণও এ অঞ্চলে শব্দ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি করছে।

www.nagorikpathagar.com

বিশেষজ্ঞগন উত্তরাঞ্চলের সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পাঁচ দফা সুপারিশ করেছেন। এক. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি উপায়-উপকরণ প্রাপ্তির সুযোগও সহজলভ্য করতে হবে। দুই. বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তিন. ভেজাল খাদ্য এবং কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। চার . স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চিকিৎসালয়গুলোতে চিকিৎসা উপকরণ আধুনিকায়ন ও ওষুধ সরবরাহ বৃদ্ধি এবং চিকিৎসক সংকট দূর করতে হবে। পাঁচ. দারিদ্র ও অশিক্ষা সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা হ্রাস করতে হবে।

একজন বিশেষজ্ঞ বলেন

এই অঞ্চলে ডায়াবেটিক, হৃদরোগ, কিডনী রোগ প্রভৃতি সমস্যা প্রসঙ্গে আলাপ করা হয় দেশের বিশিষ্ট হৃদরোগ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডা. মো. আবুল হোসেনের সঙ্গে। তাঁর মতে, এ অঞ্চলে ধূমপান ও নেশাজাত দ্রব্যের প্রতি আসক্ত মানুষের রোগের আক্রমন প্রতিরোধে সক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। উচ্চরক্তচাপের রোগীরা তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে ততোটা সচেতন নয়, গুরুত্বও দেয় কম। প্রতিরোধে তেমন আগ্রহ নেই। আর এই এলাকার মানুষ খানিকটা আরামপ্রিয়। এধরনের লোকদের ডায়াবেটিক টেনডেনসি বেশী। রোগীদের এসব রোগের চিকিৎসার জন্য ভারত যাবার আগ্রহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ ঢাকার নিরাপত্তা সমস্যাকে ভয় পায়। সেখানে দালালদের উপদ্রব বেশী বলে অনেকের অভিযোগ। ভারতে এ ধরনের ভয় কম। সেখানে প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টের ব্যয়ও কম বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর প্রতিকার প্রয়োজন। (রচনাকাল : ডিসেম্বর,২০০২)

www.nagorikpathagar.com

আর্সেনিক কবলিত এক জনপদ

শিশুটিকে সদ্য প্রসূতই মনে হচ্ছিল। দাদীর কোলে কোন রকমে লেপ্টে থাকা শিশুর বয়স এক বছর বলে জানা গেল। অনেকেই একসঙ্গে বলে উঠলো, এটা পিঞ্জিরার ছোট্ট মেয়ে। নাম যুথি। এই যুথি এবং বড় মেয়ে শাপলা (১৩) ও মেজ ছেলে আরিফ (৭)কে রেখে দেড় মাস আগে মারা গেছে পিঞ্জিরা ।

পিঞ্জিরা খাতুন (৩০) সংবাদপত্রের কল্যাণে পরিচিত পেয়েছে। তাও অকাল মৃত্যুর পর। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল সে। দীর্ঘদিন ভুগেছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি ছিল ১৯৯৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ মাস। অতঃপর রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরো দু'মাস। চিকিৎসায় কাজ হয়নি। বাড়ি ফিরে একদিন সে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। স্বামী মাসুদ রানা অপেক্ষা করেনি। দ্বিতীয় বিয়ে করেছে যথারীতি।

রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার মিয়াপুর এখন আর্সেনিক বিক্ষত এক জনপদের নাম। পিঞ্জিরা ছিল এখানকার গৃহবধূ। শ্বশুর বাড়িতে নলকূপের পানি পান করে আক্রান্ত হয়েছিল আর্সেনিক দূষণে। মৃত্যু ঘটেছে পিতৃগৃহে একই থানার কাঁকড়ামারী গ্রামে। মিয়াপুর গ্রামের হাওয়া বেগম (৬০), ফেরদৌসী খাতুন (২৪), জোলেখা (৩০), রুবি (২৫), রমেলা (১৭) এরকম আরো অনেকে আর্সেনিক দূষণের শিকার।

চারঘাট থানা সদর পৌরসভায় উন্নীত হয়েছে বেশি দিন হয়নি। থানা কমপ্লেক্স থেকে এক কিলোমিটার পূর্বে পৌরসভাভুক্ত মিয়াপুর গ্রাম। থানার পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তকে বেষ্টন করেছে পদ্মা নদী। আর উত্তর প্রান্ত দিয়ে মিয়াপুরকে প্রায় ছুঁয়ে গেছে পদ্মার অন্যতম শাখা বড়াল। থানার বিপরীতে পদ্মার অপর পাড়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলা, যেখানে আর্সেনিক দূষণে হাজার হাজার পরিবার ইতোমধ্যে বিপর্যস্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পদ্মার অববাহিকায় বড়ালের সংযোগে চারঘাট এলাকা আর্সেনিক দূষণ কবলিত হওয়া অসম্ভব নয় বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞর অভিমত।

মিয়াপুরে বসবাসরত পরিবারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬'শ। জনসংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। এই হিসেব রাজশাহী সিভিল সার্জন অফিসের। এখানকার মানুষ জানে, আর্সেনিক একটা বিষ। তবে কোথা থেকে এই বিষ আসে তা জানে না। দীর্ঘদিন যাবত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধকল গেছে তাদের ওপর। ফলে অনেকেই সচেতন হয়েছেন আর্সেনিক সম্পর্কে । তবে টিউবওয়েলের পানির সহজ বিকল্প এখনো ওদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে।

মিয়াপুরে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান তৈরী হয়নি। যারা নিজে উদ্যোগী হয়ে চিকিৎসক বা জরিপ দলের সামনে হাজির হয়েছে তাদের তথ্য পাওয়া গেছে। রাজশাহী সিভিল সার্জন অফিসের হিসেবে চারঘাট থানায় আক্রান্ত ৬৫জন। এর মধ্যে

www.nagorikpathagar.com

মিয়াপুরের ৫৩ জন। চারঘাট থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে'৯৮ এর সেপ্টেম্বর থেকে'৯৯ এর ২৬ জুন পর্যন্ত ৭৩ জন রোগী তালিকাভূক্ত হয়। এর মধ্যে মিয়াপুর গ্রামের রোগী ৪০ জন। ধারণা করা হয়, এর বাইরেও সাতগুণ রোগী আছে, যারা সামাজিক কারণে রোগ গোপন করে রাখে।

মিয়াপুরের রোগীরা এখন কোন ওষুধ পাচ্ছে না। মঞ্জুরের স্ত্রী রমেলার অভিযোগ, হাসপাতালে ওষুধের জন্য গেলে ওষুধ নেই বলে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আবদুস সাত্তারের পরিবারে ৮ জন আক্রান্ত। তিনি জানান, ডাক্তারের কাছে গেলে বলতে পারেনা কি অসুখ। কোন ওষুধ নেই। শুধু বলে, পানি বদলিয়ে পান করতে। কিন্তু সে পানি কোথায় পাওয়া যাবে-সে কথাও বলে দেয় না।

চারঘাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আর্সেনিক দূষণজনিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য একজন মেডিক্যাল অফিসারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি ডাঃ আখতার আহসান। গত ২৭ জুন '৯৯ তিনি জানান, প্রথম দফায় তিন মাসের কোর্স দেয়া হয়েছিল ওষুধের। ওষুধের মধ্যে ছিল ভিটামিন এ, সি এবং ই। সঙ্গে পেনিসিলিন 'ডি' ক্যাপসুল ও একটি মলম। 'কেয়ার' কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রথম দফার ওষুধ শেষ হবার পর আর ওষুধ না পাওয়ায় অনেকেই আসে না। এই হেলথ কমপ্লেক্সে মিয়াপুর ছাড়াও চারঘাটের বামনীদহ, চারঘাট, অনুপমপুর, বামনদীঘি,ধোপাপাড়া, ঝিকড়া, সাদিপুর,হরিরামপুর এবং পার্শ্ববতী পুঠিয়া থানার ক্ষুদ্র জামিরা গ্রামের আর্সেনিকজনিত রোগী তালিকাভুক্ত আছে। রাজশাহী সিভিল সার্জন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানেও যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধ নেই।

আর্সেনিকদূষণজনিত রোগটির এখন পর্যন্ত নাম নেই। আপাততঃ একে আর্সেনিকোসিস বলা হচ্ছে। আর্জেন্টিনায় এই রোগের নাম 'বেলভিল'। তাইওয়ানে ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মেলানোসিস (চামড়ার রং কালো হয়ে যাওয়া) ও কেরাটোসিস (হাত-পায়ের তালু খসখসে ও শক্ত হয়ে যাওয়া) নাম প্রচলিত আছে।

মিয়াপুরের (সাবেক খালিসপুর) ফেরদৌসী (২৪) গত তিন বছর ধরে অসুখে আক্রান্ত। স্বামী খোরশেদ স্ত্রীর চিকিৎসা নিয়ে চরম ব্যাকুল। তার চিকিৎসার জন্য যে যা পরামর্শ দিয়েছে তাই করেছেন। কবিরাজী-হোমিও-ঝাড় ফুঁক কিছুই বাদ রাখেননি। দু'ছেলে ও এক মেয়ের জননী ফেরদৌসীর হাতে, পায়ে, শরীরে আর্সেনিক দূষণের সব লক্ষণই পরিস্ফুট । গত বছর ৭ সেপ্টেম্বর '৯৮ চারঘাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু চিকিৎসায় অগ্রগতি হয়নি। এখন কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। রাজশাহী যক্ষা কেন্দ্রে পর পর চার বার এক্সরে করিয়েও যক্ষা ধরা পড়েনি-বললেন খোরশেদ। টিউওয়েলের পানি বাদ দিয়ে কুয়ার পানি পান শুরু করেছেন কিছুদিন আগে। পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে তাদের ধারণা। পাশাপাশি বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন। রাজশাহীর মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

www.nagorikpathagar.com

প্রফেসর জলিল চৌধুরী গত ১১ জনু'৯৯ তারিখে প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। লিখেছেন, চার সপ্তাহ পর পর ইঞ্জেকশন জি বেনজামিন পেনিসিলিন (১২লাখ) নিতে । সঙ্গে ট্যাবলেট ক্লোরাজাম (১০ মি.গ্রা) ও ট্যাবলেট স্যালবিউটামল (২মি.গ্রা)। এ পর্যন্ত এক ডোজ ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে।

চারঘাটের মিয়াপুরে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন নলকূপের পানিতে দূষণমাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ তাদের বসানো নলকূপ পরীক্ষা করেছে। তিনটিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পেয়েছেন তারা । চারঘাট থানায় মোট সরকারি নলকূপ রয়েছে ২৩৩২টি। এর মধ্যে অগভীর ১৭০৮টি, গভীর ৫৮টি এবং তারা পাম্প ৫৬৬টি। মিয়াপুরে আর্সেনিক দূষিত তিনটি নলকূপের জায়গায় একটি তারা পাম্প স্থাপন এবং দু'টি নলকূপ বেশি গভীরতায় পুনঃস্থাপন করে আর্সেনিকমুক্ত করা হয়েছে। অন্যগুলোর খবর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের জানা নেই।

রাজশাহীর বেসরকারি সংস্থা মহিলা মঙ্গল তাদের 'এ্যাকুয়াকীটস' দিয়ে চারঘাটের ৫৫টি নলকূপের পানি পরীক্ষা করেছে। এর মধ্যে ১৪টিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক মিলেছে। তাদের ভাষ্যমতে, মিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তারা পাম্পে দশমিক ২ মাত্রা পাওয়া গেছে। চারঘাট পাইলট হাইস্কুলের তারা পাম্পেও একই মাত্রা পাওয়া গেছে। মিয়াপুরের দু'টি নলকূপের পানি রাজশাহী সিভিল সার্জন অফিসে নিয়ে পরীক্ষা করা হলে তাতেও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে। মহিলা অঙ্গন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মাফরুহা হক বেলা জানান, সংস্থার উদ্যোগে 'নিপসম' থেকে প্রাপ্ত ১৫'শ লিটার পানি পরিশোধন উপযোগী ১০৫ কার্টুন পরিশোধক চারঘাট এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। গত জানুয়ারির পর এই ওষুধ আর পাওয়া যায়নি। মিসেস বেলা জানান, তাদের পক্ষ থেকে মিয়াপুরসহ চারঘাট এলাকায় গ্রুপ মিটিং করে জনসাধারণকে আর্সেনিক বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে, এখানকার মানুষ এখন বেশ সচেতন। তিনি অভিযোগ করেন, মহিলা মঙ্গলের পক্ষ থেকে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কাছে আর্সেনিক প্রতিরোধের জন্য আর্থিক সাহায্য চাওয়া হলে তারা তহবিলের অপ্রতুলতার কথা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগও এ সংক্রান্ত আবেদনের আদৌ কোন জবাব দেয়নি।

সাধারণ মানুষ দূরে থাকুক, এই কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট অনেকেই আর্সেনিক দূষণের উৎস সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। একজন চিকিৎসক শুধু জানেন, প্রধানতঃ অপুষ্টিজনিত অসুবিধায় ভুগছে এমন মানুষেরা এর শিকার হয়। দুষণ কেন ঘটে তার জানা নেই। একজন এনজিও কর্মীও এব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাজশাহী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের পল্লী পানি সরবরাহের কার্যক্রমের নির্বাহী প্রকৌশলী সারওয়ার জাহানের মতে,

www.nagorikpathagar.com

যেসব স্থানে সেচের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত পানি উত্তোলন করা হয়, সেসব স্থানে ভূ-গর্ভে শূন্যতাজনিত কারণে একটা পর্যায়ে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। চারঘাটের মিয়াপুরে এমন ধরনের সেচ পরিস্থিতির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আর্সেনিক দূষণের কারণ সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট কিছু জানাতে পারেননি।

বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে ভূ-গর্ভে আর্সেনিকের দূষণ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেলেও ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম সে তুলনায় গড়ে তোলা হয়নি। এনজিও পর্যায়ে ক্ষুদ্র 'কীটস' ব্যাপক পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। সিভিল সার্জন অফিসেও একই ধরনে কীটস' ব্যবহার করা হচ্ছে। যা ব্যাপক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ নয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের ল্যাবরেটরীতে কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকলেও তা নিম্নবিত্তের মানুষের নাগালের বাইরে। একটি নমুনা পরীক্ষার জন্যই পাঁচশত টাকা দিতে হয়। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় এখানকার পরীক্ষা ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত। ফলে এখন পর্যন্ত শত শত নমুনা এই ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের একজন প্রকৌশলী এনজিওগুলোর পরীক্ষা কার্যক্রমকে সন্দেহমুক্ত নয় বলে দাবি করেন।

মিয়াপুরের মানুষ আর্সেনিকযুক্ত নলকূপের পানির কোন বিকল্পের কথা এখনো জানে না। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে অন্য উৎস যেমন পুকুর, নদী বা বৃষ্টির পানি পান করতে। কিন্তু পুকুর-নদীর পানি পান করলে কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয় হতে পারে এই ভয়ে এই পানি পান করা অনেক আগেই ছেড়েছে তারা। এসব পানি ফুটিয়ে পান করার কথা বলা হলেও জ্বালানীর ব্যয় বাহুল্য কিংবা ফোটানো পানি পান করতে তারা অভ্যস্ত নয়। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কোন প্রযুক্তিও এখানে পৌঁছায়নি। কারো বাড়িতে কোন ধরনের ফিল্টার নেই। অগত্যা চোখ বন্ধ করে নলকূপের পানিই পান করে যাচ্ছে তারা। তবে চিহ্নিত টিউবওয়েলের পাশে কোন বিকল্প থেকে তার ব্যবহার সচেতনতা এসেছে খানিকটা।

একমাত্র বিকল্প বর্তমান নলকূপ চালু রেখেই তা আর্সেনিকমুক্ত করার ব্যবস্থা-এই দাবি করলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের নির্বাহী প্রকৌশলী সারওয়ার জাহান। নলকূপ 'সীল' বা বন্ধ করে দেয়ার যে নীতি তার তিনি বিরোধী। এখন পর্যন্ত নলকূপের পানির কোন বিকল্প এই অঞ্চলে করা যায়নি। তাই ব্যয়বহুল হলেও যে স্থানে যতটুকু গভীরতায় সহনীয় মাত্রার আর্সেনিক আছে সেখানে ততোখানি গভীরে নলকূপ পুনঃস্থাপন করতে হবে। এটা স্থান বিশেষে ৬০ থেকে ১৫০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে মিয়াপুরে দু'টি নলকূপের সাফল্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

সরকারি ৪ দফা কর্মকৌশলে আছে : ১. জরুরী ভিত্তিতে আর্সেনিক আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সনাক্ত ও তাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা, ২. নিরাপদ পানির কার্যকর, বাস্তবসম্মত, বিকল্প অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, ৩. ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের উৎস ও কারণ খুঁজে

www.nagorikpathagar.com

বের করা এবং ৪. আর্সেনিক দূষণ ও দূষিত পানি পান না করার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

গত বছর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে সর্বত্রই পেয়েছে ভয়াবহ চিত্র। এতে সন্দেহ হয়, ব্যাপার কি? অনুসন্ধানে জানা যায়, পরীক্ষা কাজের জন্য যে জিঙ্ক বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল সেই জিঙ্কেই ছিল আর্সেনিক দূষণ। পরে নতুন টেন্ডার দেয়া হয় আর্সেনিকমুক্ত জিঙ্ক আমদানির জন্য। ❐

(রচনাকাল : জুলাই ১৯৯৯ইং)

www.nagorikpathagar.com

ভেতর থেকে পাল্টে যাচ্ছে বরেন্দ্র চিত্র
সব কিছু হচ্ছে পরিবেশ অনুকূল

ভেতরে ভেতরে পাল্টে যাচ্ছে বরেন্দ্র চিত্র। এক সময়ে মরু সদৃশ এই ভূমির মানুষের জীবন যাত্রার ছবিও স্নিগ্ধ হচ্ছে। গত দু'দশক জুড়ে গৃহীত বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ডই এই চিত্র পাল্টানোর অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২৫টি উপজেলা নিয়ে গঠিত বরেন্দ্র ভূমিতে এখন সবুজের ছায়া দূর্লভ নয়। গাড়ির চাকা মাটিতে দেবে যাবার দিন শেষ হয়ে এখন হয়েছে গতিমান। হারিকেন, কেরোসিন কুপির আলো-আঁধারি দূর করে বিদ্যুতের ঝলমলে বাতি দেখা যায় বহু দুর্গম গ্রাম প্রান্তরে। জমির পতিত থাকা কিংবা এক ফসলী হবার জড়তা কেটে এখন দু'তিনটি ফসলের স্বপ্ন সহজেই দেখতে পারে কৃষক। খাল- ডোবা পকুরের দুষিত পানির নির্ভরতা কাটিয়ে বিশুদ্ধ পানি হাতের নাগালে এসেছে।

বরেন্দ্রের যে কোন গ্রামে যাবার জন্য তিনদিনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। সকাল-সন্ধ্যের প্রস্তুতিতেই চলে দ্রুতগামী যানবাহনের নিরন্তর চলাচলে। এভাবে বরেন্দ্রের গৃহস্থ, চাষী,কৃষক,দিনমজুর সর্বশ্রেণীর মানুষের জড় জীবনের অভিশাপ থেকে গতিময় জীবনের সিংহদ্বার যেন খুলে গেছে।

১৯৮৫ সালে বরেন্দ্র এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক ও বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণের পর এ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ২০ বছরে। এর মধ্যে ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছর থেকে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমাপ্ত ৮টি প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে এক হাজার ৬৭ কোটি টাকার বেশী। বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে আরও ৯টি প্রকল্প। এ গুলোর মোট ব্যয় ধরা আছে প্রায় দু'হাজার কোটি টাকা। যার মধ্যে ২০০৫ সাল পর্যন্ত অগ্রগতিপ্রাপ্ত প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে সাড়ে ৩শ কোটি টাকার বেশী। বাকী আরও দেড় হাজার কোটির টাকার বেশী অর্থ ২০০৯ সালের মধ্যে ব্যয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পসমূহে সরকারি বরাদ্দে সম্পন্ন হলেও পরবর্তীকালে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। কোন একটি প্রকল্পে সরকার প্রাথমিক বরাদ্দ দিলেও পরবর্তী কার্যক্রম কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিএমডিএ নিজেই পরিচালনা করছে। বৃহত্তর রাজশাহীর ২৫টি উপজেলায় বরেন্দ্রের কার্যক্রম সাফল্য পাবার প্রেক্ষাপটে সরকার উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য গভীর নলকূপসমূহ চালু করার দায়িত্ব দিয়েছে বিএমডিএকে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার মধ্যে রয়েছে, গভীর নলকূপ স্থাপন, নলকূপের জন্য সেচ নালা নির্মাণ, সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ, সড়ক পাকাকরণ,হাজামাজা খাল ও পুকুর পুনখনন, বনায়ন,গভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সরবারাহ,সরু ও সুগন্ধি চাল উৎপাদন প্রভৃতি। এছাড়া আনুষঙ্গিক আরও কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুফল হিসেবে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো, ফসলের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য

www.nagorikpathagar.com

সৃষ্টি, যোগাযোগ-যাতায়াত ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে যেখানে ফসল উৎপাদন হতো প্রায় ৬লাখ মেট্রিক টন, সেখানে বর্তমানে ১২লাখ মেট্রিক টনের বেশী ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। যার বাজার মূল্য ৭শ কোটি টাকার বেশী। এই এলাকায় বর্তমানে খাদ্য উদ্বৃত্ত হয় সাড়ে ৭ লাখ মেট্রিক টন। ১৯৮৫ সালের পূর্বে এই অঞ্চলে বিএডিসির উদ্যোগে যেখানে গভীর নলকূপ ছিল ৫শ'টি, বর্তমানে এই ৩ জেলায় এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬হাজার ৬শ'২৬টি। ফলে পূর্বে যেখানে সেচ এলাকা ছিল মাত্র প্রায় ৫ হাজার হেক্টর, এখন তা সম্প্রসারিত হয়ে ২ লাখ ৭৫ হাজার হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। ভু-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে পুকুর ও খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় ১৪ হাজার খাস মজা পুকুর খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আগে এগুলো সবই ছিল প্রায় ভরাট এবং পানি ব্যবহারের অনুপযোগী। বর্তমানে এ পর্যন্ত ২ হাজার ১৪৪টি পুকুর পুনঃখনন করে এগুলো সেচ ও মৎস্য চাষ উপযোগী করা হয়েছে। এর চার ধারে লাগানো হয়েছে গাছ। এই সঙ্গে ৩শ' কিলোমিটারের বেশী খাল একেবারে বদ্ধ ও ভরাট হয়ে যায়। যেগুলো খনন করার কাজে হাত দিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করা সম্ভব হয়েছে। এসব খালে পানি সংরক্ষণের জন্য পূর্বে কোন ক্রসড্যাম ছিল না। এখন ৪৮টি ক্রসড্যাম হয়েছে। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ করা হয় প্রায় ৩ লাখ। এখন এই বৃক্ষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ। প্রকল্প গ্রহণের পর পাকা রাস্তা তৈরিরও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তিনটি জেলায় প্রায় ১২শ' কিলোমিটার কাঁচা রাস্তার মধ্যে ১১৯৬ পর্যন্ত মাত্র দেড়' কিলোমিটার মতো রাস্তা পাকা হয়। বর্তমানে এর পরিমাণ পৌঁছেছে প্রায় ৫শ' কিলোমিটারে। বাকী ৭শ' কিলোমিটারও পর্যায়ক্রমে পাকা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বরেন্দ্রে যেখানে খাবার পানি পাওয়া ছিল অত্যন্ত কষ্টের সেখানে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। '৯০-এর দশকে এই কার্যক্রম হাতে নিয়ে এক দশকে ২৫টি উপজেলার প্রতিটিতে ২টি করে গভীর নলকূপে ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন করা সম্ভব হয়। এ বছর পুরো এলাকায় ১২৯টি পানি সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কমাতে সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন কাজও হাতে নেয়া হয়। ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৩শ' গভীর নলকূপ বৈদ্যুতিকরণ করা হয়। বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫হাজার। শুধু গভীর নলকূপই নয় বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের ফলে এই অঞ্চলে আবাসিক এলাকা ও বাজার-হাট ছাড়াও ক্ষুদ্র শিল্প ও ফ্যাক্টরী, ডেইরী, পোলট্রি, হ্যাচারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ কাজে লাগছে। কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩০ হাজারের বেশী কৃষক এ ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছে বলে জানা গেছে। এই সঙ্গে বরেন্দ্রে উৎপাদিত সরু চালের বিশ্বব্যাপী বাজার সৃষ্টি এবং কৃষকদের আর্থিক লাভ বিবেচনা করে এর সম্প্রসারণকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় সেমিনার, কর্মশালা,প্রদর্শনী, প্লট স্থাপন, বীজ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, পরিবেশ ব্যবস্থপনা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ১০টি ইকো-গ্রাম ও ১টি মিনি ইকোপার্ক তৈরি করা হয়েছে। এসব গ্রাম হবে সকল দিক দিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপযোগী। এক বিশাল কর্মকান্ডের মধ্যদিয়ে বরেন্দ্রে বইছে পরিবর্তনের হাওয়া।

www.nagorikpathagar.com

ঠা-ঠা বরেন্দ্রের মানুষকে এখন পানি কিনে খেতে হয়না

ঠা-ঠা বরেন্দ্র বলে পরিচিত ভূমির মানুষকে প্রবল খরায় এক গ্লাস পানি কিনে খেতে হতো। বিশুদ্ধ পানির অভাবে খাল-ডোবা, কূয়া-ইঁদারার পানি দিয়ে জীবন বাঁচাতে হতো। এখন সে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। শুধু উৎসই বৃদ্ধি পাচেছ না, বিশুদ্ধ খাবার পানি হাতের নাগালে পৌঁছে যাচ্ছে। নগর-শহরের মতোই পাইপ লাইনে এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রাম-গ্রামান্তরে। যা আলোড়ন তুলেছে একদা পানি বঞ্চিত মানুষদের মনে। বরেন্দ্রের পানি সংকটে জর্জরিত পোরশা, সাপাহার, নিয়ামতপুর, নাচোল প্রভৃতি এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, এসব এলাকায় পানির সেই সংকটাবস্থা অনেকটাই কাটিয়ে উঠা গেছে। সাপাহারের কোন স্থানে এখনো ২৫/৩০ ফুট গভীর ইঁদারা থেকে বালতি ফেলে অত্যন্ত কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করতে হচেছ। হস্তচালিত নলকূপগুলো খরা আসলেই অচল হয়ে পড়ে। হোটেল-রেষ্টুরেন্টে কথা বলে জানা গেল, এখন সেগুলোতে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাচ্ছে। যা ছিল এক সময় দূর্লভ। পুকুরের পানি বাড়ীর সকল গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার হতো। এমনকি গরু-মহিষ ধোয়ার কাজেও। এখন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। মানুষকেও দেখা গেছে যথেষ্ট সচেতন। বিশুদ্ধ দূষিত পানির পার্থক্যবোধও জেগেছে।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁর ২৫টি উপজেলায় 'সেচের গভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প' শুরু করে ২০০২ সালের জুলাই মাসে। এই প্রকল্প আগামী বছর জুন পর্যন্ত চলার কথা। এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৩৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। গতবছর পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি টাকা। গত বছর (২০০৪) পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ২৫০টি পানি সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণ, ২৬টি সম্প্রসারণ লাইন নির্মাণ, ৩টি অফিস ভবন ও ১টি ল্যাবরেটরী স্থাপন। এই ল্যাবরেটরীতে আর্সেনিকসহ বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা নির্ণয় করা যাবে। সূত্র জানায়, পানি অবকাঠামো নির্মাণ এ পর্যন্ত ১২৯টি সম্পন্ন হয়েছে। এগুলো স্থাপিত হয়েছে নবাবগঞ্জ সদরে ২টি, শিবগঞ্জে ৩টি, নাচোলে ১৪টি, ভোলাহাটে ২টি, গোমস্তাপুরে ১০টি, নওগাঁ সদরে ১টি, মহাদেবপুরে ৪টি,পত্নীতলায় ৪টি,ধামইরহাটে ৬টি, সাপাহারে ৬টি, পোরশায় ৩টি,মান্দায় ৩টি ও নিয়ামতপুরে ১৩টি। রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ১৩টি,তানোরে ২১টি,পবায় ৬টি, মোহনপুরে ৩টি, বাগমারায় ৪টি, দুর্গাপুরে ১টি,পুঠিয়ায় ২টি এবং চারঘাটে ১টি। এ বছর (২০০৫-০৬) আরো ৭০টি পানি অবকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ জমিতে সেচ দেবার জন্য যেসব গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে, সেগুলোর পাশে ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ করে নলকূপের পানি ধারণ ও পাইপের মাধ্যমে খাবার পানি হিসেবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর ফলে একই পানি দ্বিমুখী কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। গভীর নলকূপের হবার ফলে এর পানি মোটামুটিভাবে ক্ষতিকর পদার্থ থেকে মুক্ত থাকে।

www.nagorikpathagar.com

সূত্র জানান, প্রতিটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক থেকে ১৫০ থেকে ২০০টি পরিবার পানির সংযোগ নিতে পারে। এজন্য নির্দিষ্ট চার্জ দিতে হয়। যা পানি অবকাঠামো সংরক্ষণ ও মেরামত কাজেই লেগে যায়। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এ থেকে তেমন একটা রিটার্ন পায় না। বলতে গেলে এই কার্যক্রম সেবামুলক অনেকটাই। নাচোল,গোমস্তাপুর, পোরশা, সাপাহার প্রভৃতি শুকনো এলাকায় দেখা গেল, বাড়ীতে, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, রাস্তার পাশে পানির সংযোগ নেয়া হয়েছে।একদা বিশুদ্ধ ও প্রয়োজন পরিমাণ পানি থেকে বঞ্চিত বরেন্দ্রে এখন সরবরাহকৃত পানি বিপুল জনপ্রিয় হয়েছে। ফলে এর সম্প্রসারণ জরুরী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উঁচু বরেন্দ্র ভূমিতে প্রতিটি জনবসতিতে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা প্রয়োজন বলে এলাকার মানুষ জানান। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প আরও জোরদার করবে বলে তারা আশাবাদী হয়ে আছে।

ভূ-গর্ভের পানির উপর চাপ কমছে

বরেন্দ্র ভূমির সেচ পদ্ধতি কি প্রাচীন যুগেই ফিরে যাচ্ছে? পরিবেশের জন্য সেই পদ্ধতিই অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। যাঁত,দোন,ডোঙ্গা প্রভৃতি মাধ্যম উঠে গিয়ে যন্ত্রচালিত সেচ ব্যবস্থা জায়গা নিলেও আদিম ব্যবস্থার কার্যকারিতা যেন ফুরিয়ে যায়নি। এখন মাধ্যম যাই হোক-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থিত পানির উপর এর ফলে চাপ কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে এক সময় জমি আবাদের জন্য বছরে কয়েকমাস বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গতি ছিল না। হতো মাত্র একটি ফসল।

সে সময় রাজা-জমিদাররা বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে খনন করেছিলেন বহুসংখ্যক পুকুর। নদী-বিলের সঙ্গে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা খাড়ি ও খালের ছিল সংযোগ। শতশত পুকুর ও খাল ছিল বছরব্যাপী পানির উৎস। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কারের অভাবে এসব উৎস হয়ে যায় ভরাট। হাজা-মজা রূপ নেয় এগুলো।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ভূ-গর্ভের পানির উপর চাপ কমাতে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণে বরেন্দ্র এলাকায় গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাপক সুফল দিতে শুরু করেছে। পরিবেশ অনুকূল এই কার্যক্রম বরেন্দ্র অঞ্চলে সাড়া জাগিয়েছে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন , প্রায় অর্ধশত ক্রস ড্যাম নির্মাণ এবং দুই সহস্রাধিক মজা পুকুর খনন করেছে যা এই লক্ষ্য অর্জনের কাজ এগিয়ে নিতে সহায়ক হয়েছে বলে বিএমডিএ কর্মকর্তারা মনে করছেন।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের এ ধরনের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় মডেল হলো রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার 'সরমংলা খাড়ি।' প্রায় পরিত্যক্ত খালকে সংস্কার করে পানির সারাবছরের সংরক্ষণাগার হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি বনায়ন, সেচ,মৎস্য চাষ প্রভৃতির এক বহুমুখী আদর্শ প্রকল্প। ইউএনডিপি ও এসইএমপি-এর সহায়তায় ২১ কিঃ মিঃ দীর্ঘ এই খালের অর্ধেক খনন করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। বর্ষার সময় এই খাল পানিতে পূর্ণ থাকলেও খরার

www.nagorikpathagar.com

সময় পাইপের মাধ্যমে পদ্মানদী থেকে পানি এনে এটি ভরে রাখা হয়। ২০০৩ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই পানি সঞ্চালন কাজের উদ্বোধন করেন। এর আগে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এর উভয় পাড়ে বৃক্ষরোপণ কাজের উদ্বোধন করেন। সরমংলা খাড়ি চালু রাখতে ৩ কিঃমিঃ বেশী ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন ও ৭টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। অচিরেই খালের বাকী অংশের খনন ও ৪টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করা হবে। এসব ক্রসড্যাম পানি ধরে রাখার জন্য সহায়ক। খালের দু'পাড় জুড়ে এ পর্যন্ত ৩৬ হাজারের বেশী গাছ লাগানো হয়েছে। এসব গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে ফল ও কাঠের বৈচিত্র্য ও উপযোগিতা রক্ষা করা হয়েছে। এখানে ৭টি লো-লিষ্ট পাম্প ব্যবহৃত হচ্ছে সেচ কাজে। আবাদ সুবিধা পাচ্ছে প্রায় ৪শ' একর জমি। পুরো খাল প্রকল্পের আওতায় আসলে ৫শ' হেক্টর জমি সেচ সুবিধা পাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বরেন্দ্র অঞ্চলের (২৫টি উপজেলা) প্রত্যন্ত এলাকা জুড়ে প্রায় ৪শ' খাড়ি বা খাল রয়েছে। এগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ হাজার কিঃমিঃ। এগুলো কখনোই পুনঃখনন বা সংস্কার না হবার ফলে হাজামজা ও ভরাট হয়ে যায়। কিন্তু জরিপে এসব খাড়ির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এক সময় এসব খাল বা খাড়িগুলোই ছিল মরুসদৃশ বরেন্দ্রের জন্য রক্তসঞ্চালন নালির সমতুল্য। বরেন্দ্র অঞ্চলের সরমংলা খালের মত বিখ্যাত বহু খাল রয়েছে বহু প্রাচীন কাল থেকে। এর মধ্যে গোদাগাড়ী উপজেলায় অন্ততঃ ৭৩ কি:মি:, তানোরে ৭৫ কি:মি:, মোহনপুরে ৩১ কি:মি:, নবাবগঞ্জে ২৭ কি:মি:, গোমস্তাপুরে ৮৫ কি:মি:, নাচোলে ৫৮ কি:মি:, মহাদেবপুরে ১৩০ কি:মি:, পত্নীতলায় ১০০ কি:মি:, সাপাহারে ৭০ কি:মি: পোরশায় প্রায় ৯০ কি:মি:, নিয়ামতপুরে ১২০ কি:মি:, ধামুইরহাটে ২৭ কি:মি:, মান্দা ও বদলগাছীতে ২০ কি:মি: করে খাল রয়েছে। এসব উপজেলা 'ঠা-ঠা বরেন্দ্র' বলে সুপরিচিত। একদা এসব খালই ছিল এই এলাকার পানির মূল উৎস।

বরেন্দ্র অঞ্চলে এছাড়াও খাস ও বন্দোবস্তপ্রাপ্ত পুকুর রয়েছে প্রায় ১৪ হাজার। এগুলোর বেশীর ভাগই ছিল সংস্কারের অভাবে হাজামজা। সংস্কার করলে এগুলো পানির সংরক্ষণগার ও মৎস্য চাষের বিরাট উৎসে পরিণত হতে পারে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এসব পুকুর সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইনগত নানা জটিলতা মোকাবেলা করে এই পর্যন্ত প্রায় ১২শ' পুকুর সংস্কার করেছে। এগুলোর মাধ্যমে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ তেমন আর্থিকভাবে সরাসরি লাভবান না হলেও এগুলো জনসাধারণের উপকারে লেগেছে এবং পরিবেশের জন্য সহায়ক হয়েছে। পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতিরও সহায়ক হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

৮হাজার গভীর নলকূপ ১ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের নিশ্চয়তা দিচ্ছে

বরেন্দ্র ভূমির উপরিভাগের তপ্ত জমিন এবং ধূসর প্রকৃতি দেখে এক সময় বলা হতো এর অভ্যন্তর ভাগও সমান মরুময়। কিন্তু এখন এই ধারণা পাল্টে গেছে। শক্ত মাটি আর পাথরের স্তর ভেদ করে পানির বিপুল ভান্ডারের সন্ধান মিলেছে। যা বৃহত্তর বরেন্দ্র ভূমির ফসলের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বর্তমানে পুরো উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের এলাকায় প্রায় ৮হাজার গভীর নলকূপ ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলনের জন্য বসানো হয়েছে। এই ভূ-গর্ভে রয়েছে ২০ হাজার মিলিয়ন ঘনমিটারের বেশী পানির মজুদ। এই পানি উত্তোলন করে এখন অবধি প্রায় পৌনে ৪ লাখ একর জমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে ৭হাজার ৬৬০টি নলকূপ। এর ফলে বছরে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার খাদ্যশস্য অতিরিক্ত উৎপাদিত হচ্ছে।

বর্তমানে বিএডিসির অধীনে অচালু ও অকেজো গভীর নলকূপ রয়েছে প্রায় সাড়ে ৪হাজার। এর সবগুলো কাজে লাগানো গেলে সেচের এলাকা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ একর। যাতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১৭ লাখ টন। উল্লেখ্য, ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিভাগে গভীর নলকূপের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার। বর্তমানে এর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার। এগুলোর মালিকানায় রয়েছে বিএমডিএ, বিএডিসি ও অন্যান্য সংস্থা এবং ব্যক্তি মালিকানাধীনও রয়েছে কিছু। বিএমডিএ গত অর্থবছরে রাজশাহী অঞ্চলে ১০২৫টি নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে। এই সঙ্গে বৃহত্তর দিনাজপুর,পাবনা ও বগুড়া অঞ্চলের অকেজো ও অচালু ৪ হাজার নলকূপ চালুর প্রক্রিয়া চলছে।

বিএমডিএ-র বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে সেচ ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এর মধ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন, সেচনালা নির্মাণ, পানি বিতরণ ও সেচ চার্জ আদায় অন্যতম। কৃষককে তার প্রয়োজন মত পানি সরবরাহ করা হয়। এ জন্য কৃষকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে সেচ চার্জ আদায় করা হয়। কর্তৃপক্ষ পাবনার বেড়া থেকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ৭টি রিজিয়নে গত ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রায় ৪৪ কোটি ১২লাখ টাকা সেচ চার্জ আদায় করে। গত বছর একই সময়ে এই চার্জ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকার বেশী। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকার বেশী আয় হয়েছে এক বছরের ব্যবধানে। এ বছর সেচচার্জ আদায়ের হিসেবে দেখা যায়, রাজশাহী রিজিয়নে আদায় হয়েছে ২৬ কোটি ১১লাখ ২৮হাজার টাকা, নবাবগঞ্জ রিজিয়ন ৯কোটি ৩৩লাখ টাকা, নওগাঁ রিজিয়ন-১ এ ৭ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা, নওগাঁ-২ এ ৭কোটি ৫৬ লাখ টাকা, ঠাকুরগাঁও রিজিয়নে ২ কোটি ৫ লাখ ৮৯হাজার টাকা, দিনাজপুর রিজিয়নে ৯৮ লাখ টাকার বেশী এবং পঞ্চগড় রিজিয়নে ৪১ লাখ টাকার বেশী। এই সেচ চার্জের কুপনের লটারীও হয় প্রতিবছর। এই লটারীর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার পায় একেকজন বিজয়ী কৃষক।

www.nagorikpathagar.com

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ গভীর নলকূপগুলো চালু রাখতে জ্বালানি সাশ্রয় করার লক্ষ্যে প্রতিটি গভীর নলকূপকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়েছে। বাকীগুলো ডিজেলে চালানো হচ্ছে। বিদায়ী অর্থবছরে ১ হাজার ৯১০টি নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। কৃষক ভর্তুকী মূল্যে বিদ্যুতের সরবরাহ পেয়ে থাকে। বিএমডিএ-র সেচের পানির অপচয় রোধের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ২ হাজার ৩৬০টি গভীর নলকূপে সেচনালা নির্মাণ হয়েছে বলে জানা গেছে।

সেচ ব্যবস্থার এই বিপুল সম্প্রসারণের ফলে বরেন্দ্র আর এক ফসলী নেই। অধিকাংশ জমিই হয়েছে তিন ফসলী। এগুলোতে বছরে আবাদ হয় আমন, আউশ, বোরো, সুগন্ধিচাল ছাড়াও আলু,শাক-সবজি, গম, ডালবীজ প্রভৃতি। বিএমডিএ দাবী করছে, বৃহত্তর রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে আগে যেখানে প্রায় ৬ লাখ মেট্রিক টন ফসল উৎপন্ন হতো এখন তা দ্বিগুণ হয়েছে। ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। হয়েছে শস্যের বহুমুখীকরণ। সব মিলিয়ে সেচের নিশ্চয়তা পেয়ে কৃষককে আর সেই বৃষ্টিহীন হাহাকারে দিনগুলোতে ফিরতে হয় না। তাদের দাবী, এখন পর্যন্ত যেসব এলাকা সেচের বাইরে থেকে গেছে গভীর নলকূপ স্থাপনের অভাবে কৌশলগত কোন সমস্যা না থাকলে সেগুলোকেও সেচের আওতায় আনা হোক। কর্তৃপক্ষ জানালেন সে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বরেন্দ্রের ভেতরে পাল্টে যাবার এক বিরাট অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে গভীর নলকূপের সেচ ব্যবস্থাপনা। একথা উপকারভোগীরা একবাক্যে স্বীকার করেন।

টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার অনন্য সংযোজন
ইকোভিলেজ সৃষ্টি করেছে ব্যাপক চাঞ্চল্য

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভেতর থেকে দৃশ্যপট পাল্টে যাবার পটভূমিতে সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে আরেকটি ব্যতিক্রমী কার্যক্রম। একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ রচনার জন্য বরেন্দ্রের কয়েকটি গ্রামকে বেছে নেয়া হয়েছে। এসব গ্রামের প্রকল্পগত নামকরণ করা হয়েছে ' ইকোভিলেজ।' এসব গ্রামের মানুষরা যা কিছু স্বাস্থ্যসম্মত এবং আদর্শ পরিবেশ বলতে যা বোঝায় তার মধ্যেই বসবাস করছে। বৃহত্তর রাজশাহীর বরেন্দ্রভূক্ত এলাকায় এ পর্যন্ত ৯টি আদর্শ পরিবেশগত গ্রাম তথা ইকোভিলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইউএনডিপি এতে অর্থসহায়তা দিচ্ছে। সরকারের টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থপনা কর্মসূচীর আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলছে। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, ওভারহেড ট্যাঙ্কের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, পুকুর পুনঃখনন, বনায়ন, বায়োগ্যাস প্লান্ট, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ এবং সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম। এ পর্যন্ত নেয়া গ্রামের মধ্যে নওগাঁর পোরশা, সাহাপার, পত্নীতলা ও নিয়ামতপুর উপজেলা, রাজশাহীর তানোর ও গোদাগাড়ী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর, নাচোল ও সদর উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে গ্রাম।

www.nagorikpathagar.com

প্রকল্প সূত্রে এই কার্যক্রমের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে, বরেন্দ্রভূমির রুক্ষ পরিবেশ নিয়ে গবেষণা বিশেষজ্ঞরা বরাবর ছিলেন উদ্বিগ্ন। প্রকৃতির বৈরী আচরণের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বরেন্দ্র এলাকার মানুষ জীবন ধারণের ন্যূনতম মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অঞ্চলের মরুময়তা রোধকল্পে এবং জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ টেকসই প্রযুক্তির আদলে এই প্রকল্প গ্রহণ করে। যাতে মডেল গ্রামগুলোর মানুষ একটি সুস্থ পরিবেশে জীবন যাপনেরও মডেল হতে পারে।

এই গ্রামগুলোকে আর্সেনিক মুক্ত গভীর কূয়া বা ইন্দারা থেকে পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানি ওভারহেড ট্যাঙ্কে জমা করে পাইপ ও ট্যাপের মাধ্যমে বাড়ীতে বাড়ীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে সুপেয় পানি খেতে পারছে ভিলেজের বাসিন্দারা। ফলে বহুবিধ রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকতে পারছে। এতে পানি সংগ্রহে সময় ও শ্রমের অপচয় হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিটি ওভারহেড ট্যাঙ্কের জন্য একটি পানি ব্যবহারকারী সমিতি গঠন করে তাদের মাধ্যমে চার্জ আদায়, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রভৃতি কাজ করা হয়। গ্রামে একটি করে পুকুর রাখা হয়েছে। পুরনো পুকুর থাকলে তা খনন করে মাছ চাষসহ গৃহস্থালীর অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করা যায়। পুকুর সর্বদা পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি গ্রামে ব্যাপক বৃক্ষরোপন করা হয়। এই সঙ্গে বনজ ও ঔষধি গাছও রাখা হয়। এসব গাছ যেমন প্রকৃতিকে ঠান্ডা রাখে, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়। প্রতিটি ইকোভিলেজে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা অপরিহার্য। এই পায়খানার নিষ্কাশিত বর্জ্য যেন পুকুর, ব্যবহার্য পানি ও পরিবেশের সাথে মিশতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।
এসব গ্রামের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হলো সোলার এনার্জি ব্যাটারীতে ধারণ করে বাড়ীর আলো-বাতাসের কাজে ব্যবহার করা যায়। যেসব এলাকার বিদ্যুৎ লাইন নেই সেখানে এই সোলার সিস্টেম হালকা বৈদ্যুতিক কাজের বিকল্প হচ্ছে। এই সিস্টেম চালু করতে গ্রামের মানুষদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে। এদের অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বঞ্চিত হলেও সোলার সিস্টেম চালানোর মতো জ্ঞান আহরণ করে ফেলেছে। যা প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে বেশি আলোড়ন তুলেছে।

এই প্রকল্পের আরেক গুরুত্বপূর্ণ কমপোনেন্ট হচ্ছে বায়োগ্যাস প্লান্ট। গরুর গোবর, মানুষের মল, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, কচুরীপানা, গৃহস্থালীর আবর্জনা প্রভৃতি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে এই জৈব গ্যাস উৎপন্ন করা যায়। গ্রামগুলোতে আপাতত গরু-মহিষের বর্জ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্যাস চেম্বার স্থাপন করে এখানে প্রাপ্ত গ্যাস ঘরের বাল্ব ও রান্না ঘরে চুলা জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে। এই সঙ্গে প্লান্টের পরিত্যক্ত গোবর উন্নতমানের সার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ইকোভিলেজ ছাড়াও পুরো বরেন্দ্র এলাকাকে একটি প্রাকৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে বিশেষভাবে পৃথক প্রকল্প নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বনায়ন,

www.nagorikpathagar.com

পুকুর পুনঃখনন, ক্রস ড্যাম নির্মাণ, মিনি পুকুর খনন, জৈব সার উৎপদানের জন্য ধইঞ্চা চাষ, কম্পোষ্ট সার প্রদর্শনী, সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, বায়োগ্যাস প্লান্ট, মিনি ইকোপার্ক প্রভৃতি। আগামী এক দশকের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক না হলে এসব আয়োজন বরেন্দ্রকে ভেতর থেকে পাল্টে দেবার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

দেড় কোটি বৃক্ষ মরু পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়েছে
বেড়েছে বৃষ্টি, জৈব উপাদান

মাত্র দু'দশক আগেও বরেন্দ্র ভূমি ছিল বৃক্ষছায়া থেকে বঞ্চিত। গাছ সংখ্যা গণনা করতে পারতো যে কেউ। এখন সেদিন গেছে। সবুজ সুশীতল ছায়া বরেন্দ্রের এক সাধারণ দৃশ্য। দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ফলের বাগান। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলছে, গত দু'দশকে দেড় কোটি গাছ লাগানো হয়েছে। যা বরেন্দ্র প্রকৃতিতে ফিরিয়ে এনেছে পরিবেশগত ভারসাম্য। বৃষ্টি বেড়েছে। জমিতে ফিরেছে জৈব উপাদান। এই অবস্থা বদলে দিতে সহায়তা করেছে বরেন্দ্রের জীবন চিত্র। গবেষকদের বিবরণ বলছে, গত একাদশ শতাব্দী কাল পর্যন্ত বরেন্দ্র অঞ্চলে ছিল বিস্তৃত সবুজ বনভূমি। ১৮৫০ সালে বৃটিশ পর্যটক সাইমন বলছেন, বৃহৎ বৃক্ষ আচ্ছাদিত বনাঞ্চল বা নীচু স্থান কাঁচা ও গুল্মে বিস্তৃত এবং উচ্চস্থান শুষ্ক তৃণাবৃত। এ অঞ্চল এতো বিস্তৃত ও দীর্ঘ যে শিকারীর পক্ষে পশু শিকার প্রায় অসম্ভব।

বন্যপশু যথা- হরিণ,চিতা ও বৃহৎ বাঘের উত্তম প্রজননস্থল। ১৮৭৫ সালে উইলিয়াম হান্টার এই অঞ্চলকে কাঁটাপূর্ণ জঙ্গল হিসেবে দেখিয়েছেন। ১৮৫০ সালের পরবর্তী সময়ে নীল চাষ বন্ধ হয়ে গেলে এ কাজে নিয়োজিত সাঁওতাল শ্রমিকরাই প্রধানত বরেন্দ্র অঞ্চলের জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে কৃষি ভূমিতে পরিণত করে। এই ঐতিহাসিক বিবরণ থেকেই দেখা যায়, বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি কত দ্রুত ও কত নৃশংসভাবে ধ্বংস হয়। বরেন্দ্রের ৮ হাজার বর্গকিলোমিটারের বেশী এলাকা ও প্রকৃতি ব্যাপক ও অপরিকল্পিত ধ্বংসের ফলে পরিবেশগত বিপর্যয়ের শিকার হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি সংকট মেটানো, সৌখিন আসবাবপত্র তৈরী, জনসংখ্যার সঙ্গে বাড়িঘর বৃদ্ধি পাবার কারণে কাঠের প্রয়োজন বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বৃক্ষ উজাড় হয়েছে। রাস্তা সম্প্রসারণ, অবকাঠামো বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণও রয়েছে। একটি ভূখন্ডের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকার প্রয়োজন হলেও তা শতকরা ৯ ভাগে নেমে আসে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সেই সংকট অনেকটাই মোচন করতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবী করা হয়ে থাকে।

এই কিছু দিন আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল যে, সূর্যের প্রবল খরতাপের কারণে ঘরের বাইরে বের হওয়া ছিল দুঃসাধ্য। প্রাপ্ত হিসেব মতে দু'দশক আগে বরেন্দ্র এলাকার ছোট-বড় মিলিয়ে সাকুল্যে লাখ খানেক গাছ ছিল। যার মধ্যে তাল ও বাবলা গাছই প্রধান। গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলে লাগানো হয়েছে প্রায় ২ কোটি গাছ। পুকুরের চারপাশে, সড়কের

www.nagorikpathagar.com

দু'পাশে, পতিত জমিতে, বাড়ীর আশেপাশে, খাল বা খাড়ির উভয় তীরে এবং রেললাইনের দু'পাশে, জমির আইলে এসব গাছ লাগানো হয়েছে। বলতে গেলে, বরেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এর পাশাপাশি গাছ কাটার প্রবণতাও হ্রাস পেয়েছে। অকালে কোন গাছ কাটা হলে আশপাশের মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়।

অন্যদিকে, বরেন্দ্র অঞ্চলে ফলের বাগান করার দিকে জনসাধারণের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে আম বাগান সৃজন করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। সম্প্রতি নওগাঁর সাপাহার, পোরশা, পত্নীতলা, নিয়ামতপুর প্রভৃতি এলাকা ঘুরে দেখা গেল কৃষি জমিতে আমবাগান তৈরী করা হচ্ছে। বাগান মালিকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এই বাগান তৈরী করাকে তারা ধান-গমের চেয়ে বেশী নিরাপদ ও আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক মনে করছে। ফলের উপযোগী গাছ দীর্ঘমেয়াদে লীজ দিয়ে বাগান মালিকের আগাম অর্থ আয়ের নিশ্চয়তা মেলে। রাজশাহীর চারঘাট ও বাঘা এলাকায়ও বিপুল পরিমাণে আমবাগান সৃজন হয়েছে। বিএমডিএ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ে এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্পের আওতায় সাড়ে ৫ লাখ ফল ও প্রায় ২২লাখ বনজসহ ২৭ লাখের বেশী গাছ লাগানো হয়। নার্সারী স্থাপন করা হয় ২৫টি এবং এগুলো থেকে চারা উত্তোলন করা হয় প্রায় ৯ লাখ। এ ছাড়া গত জুন ২০০৫ পর্যন্ত এক বছরে প্রায় সোয়া ৫ লাখ গাছ লাগানো হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার ফলে এগুলো বেশীর ভাগই জীবিত আছে।

গাছ লাগানোর এই বৈপ্লবিক সাফল্যের ফলে সার্বিক পরিবেশ হয়েছে ইতিবাচক। জমিতে গাছের পাতা পড়ে জৈব উপাদান বৃদ্ধি পেয়েছে। গাছের পাতা ও ডাল-পালা দরিদ্র মানুষের জ্বালানি সহায়ক হয়েছে। পাখি বাসা করার মতো জায়গা ও খাবার পেয়েছে। ফলে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পেয়েছে। বৃক্ষ সম্পদ অনেক মানুষের সার্বিক জীবনধারাকে উন্নত করতে সহায়ক হয়েছে একথা যে কোন পর্যবেক্ষকই স্বীকার করেন।

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার ঘটছে

বরেন্দ্র অঞ্চলে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের সূত্র ধরে কৃষি প্রযুক্তিরও ব্যাপক বিকাশ ঘটে চলেছে। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিরও ঘটছে বিস্তার। যা বরেন্দ্রের জীবন চিত্রকে ভেতর থেকে পাল্টে দিতে সহায়ক হয়েছে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থার পাশাপাশি যানবাহনের যান্ত্রিকীকরণ, ফসল রোপণ ও মাড়াই পদ্ধতির পরিবর্তন, নার্সারী ও গাছের পরিচর্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই আধুনিকরণ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এর প্রভাব পড়ছে মানুষের সার্বিক জীবন যাত্রার ওপরেও। বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষি প্রযুক্তির আধুনিকায়ন সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছে সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সেচের জন্য ব্যবহৃত যাঁত, ডোঙ্গা,দোন, টব প্রভৃতি সনাতন পদ্ধতি খুব কমই ছোখে পড়ে। এখন সে স্থান প্রথমে পাওয়ার পাম্প এবং বর্তমানে গভীর ও অগভীর নলকূপ ব্যাপক হারে সে স্থান দখল করেছে।

www.nagorikpathagar.com

এখন সেচের প্রতিটি ফোটা পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এজন্য সুষ্ঠু পানি বিতরণ ব্যবস্থা তথা পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হচ্ছে। পানির চাপ ও গতি বৃদ্ধি করতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও নেয়া হয়েছে। যার নমুনা বরেন্দ্রের সর্বত্র চোখে পড়ে। জমি চাষের জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী ব্যবহার করছে কলের লাঙ্গল। স্বল্প সময়ে বেশি জমি আবাদের সুবিধা নিচ্ছে কৃষক। নিড়ানী দেয়া হচ্ছে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ধান মাড়াইয়ের জন্য পূর্বে কাঠের পাটাতনে খড় পিটিয়ে ধান ঝরানো হতো অথবা গরুর পায়ে দলিত করে ধান বের করা হতো। এখন তার পরিবর্তে যন্ত্রচালিত মাড়াই কল ব্যবহার করছে অধিকাংশ কৃষক। এতে ধান নষ্ট হওয়া কিংবা অপচয় রোধ এবং সময় ও শ্রম বাঁচানো যাচ্ছে। গম কাটা ও মাড়াইয়ের জন্য এখন রীতিমত যান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হবার পথে। জমিতে বীজ বিপনের জন্য ড্রাম সিডার পদ্ধতিও চালু হবার পথে। কীটনাশক ছিটানোর জন্য স্প্রে ব্যবহার বেশ আগেই চালু হয়েছে। ভুট্টা ঝরানোর জন্য মেশিনও ব্যবহার করছে কৃষকরা।

বরেন্দ্র অঞ্চলে খালগুলোতে পানি সংরক্ষণের জন্য ক্রসড্যাম তৈরী করা হচ্ছে। যা আধুনিক প্রযুক্তির একটি অংশ। রাবার ড্যাম স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে কর্তৃপক্ষের। ব্যাপকভাবে ময়দা ও ধান-চালের কল স্থাপিত হবার ফলে ঢেঁকি ও যাঁতার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। ঘরে ঘরে সনাতন পদ্ধতিতে ধানসেদ্ধ ও ভাঙ্গানোর প্রথা উঠে গিয়ে অটোমেটিক রাইস মিল সে স্থান দখল করেছে। উচ্চ ও দ্রুত ফল পাবার লক্ষ্যে গাছে কৃত্রিম কলম তৈরি করা এখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। নার্সারিগুলোতে গ্রীন হাউজ তৈরি করে চারা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। রাসায়নিক সার ব্যবহার কমাতে জৈব ও কম্পোষ্ট সার তৈরির জন্য প্রায় ঘরে ঘরে প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে কৃষকদেরকে বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে। যার প্রভাব পড়েছে কৃষকদের মধ্যে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ আধুনিক সেচ ও চাষাবাদ বিষয়ে বিশেষ কর্মসুচীর আওতায় ৩০হাজারের বেশি কৃষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হবে বলেও জানা গেছে। কোন জমিতে কি পরিমাণ উপাদান আছে এবং কোন ধরনের সার কি পরিমাণ প্রয়োজন তা জানতে মাটি পরীক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। কৃষকরা তাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে এবং মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাটি পরীক্ষার মোবাইল গাড়ি বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের চাহিদা পূরণ করে। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও এই প্রযুক্তি চালু করেছে বলে জানা গেছে। এভাবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বরেন্দ্র অঞ্চলে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে দ্রুত থেকে দ্রুততর।

বিপুল কর্মকান্ডের বিস্তার শত সহস্র লোকের জন্য
খুলে দিয়েছে কর্মসংস্থানের সিংহ দরজা

বরেন্দ্রেভূমিতে শুধু অবকাঠামোর উন্নয়ন বা কৃষি পণ্যের উৎপাদনই বৃদ্ধি পায়নি, লাখ লাখ মানুষের জন্য বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। শত সহস্র যুবক ও যুব মহিলার বেকারত্বের অবসান ঘটেছে। দীনহীন অবস্থা থেকে অনেকের ন্যূনতম হলেও সচ্ছলতা এসেছে। ফলে বরেন্দ্রের বহুমুখী ও বিপুল কার্যক্রম এসব মানুষের কাছে আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

বরেন্দ্র অঞ্চলে এই দু'দশক পূর্বেও কাজের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। বছরে একটি ফসল নির্ভর হওয়া, যোগাযোগ-যাতায়াতের দুর্গমতা, পুকুর ও খাল-বিল, হাজা-মজা ও ভরাট হয়ে থাকা, মিল-কারখানার অভাব প্রভৃতি কারণে কাজের অভাব ছিল সাধারণ ঘটনা। এখন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবার পাশাপাশি মানুষের আয় বেড়েছে। ফল,ফসল, হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু, মৎস্য, বৃক্ষ প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার ফলে সম্পদও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের অনেক কার্যক্রমের মধ্যে একটি বড় অংশ জুড়ে আছে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এসব নলকূপের জন্য অপারেটর পদে কাজ পেয়েছে অর্ধ ও স্বল্প শিক্ষিত বহু যুবক। এই সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দশ হাজার। আবার গভীর নলকূপের পানি নেয়ার জন্য যে কুপন ব্যবস্থা রয়েছে, এই কুপন বিক্রি করে কমিশন পেয়ে অনেকেই ভাল অর্থ উপার্জনে সক্ষম হচ্ছে প্রতি মাসে। গভীর নলকূপের সেচ বিস্তৃত হওয়ায় ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে লাঙ্গল দেয়া, ধান কাটা, মাড়াই, পরিবহন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বহু কাজের সঙ্গে অসংখ্য কৃষক-মজুর সম্পৃক্ত হয়েছে। তাদের আয় পূর্বের চেয়ে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পদ্মা ও মহানন্দা নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার পরিবার শুধু বরেন্দ্র ভূমিতে বসবাসই করছে না, তারা এখন কাজ পেয়েছে বারো মাস। পুকুর ও খাল পুনঃখনন হবার ফলে এসব জলাশয় লীজ নিতে পারছে দরিদ্র মানুষদের নিয়ে তৈরী গ্রুপ বা সমবায় সমিতি। এর মধ্য দিয়ে এসব মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারছে। রাস্তাগুলো ব্যাপকভাবে পাকা হবার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থায় বলতে গেলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় যেসব সড়কে এক কোমর পর্যন্ত কাদা জমতে দেখা গেছে এবং একমাত্র বাহন গরুর গাড়ীর চাকা ও বলদের পা ঘন্টার পর ঘন্টা দেবে থাকতে দেখা গেছে, সেগুলো পাকা হয়ে হাইওয়ের রূপ নিয়েছে। এসব পাকা সড়কে বাস, ট্রাক, পিকআপ, মোটর সাইকেল প্রভৃতি যানবাহন দাপট চলছে। এতে জনচলাচল ও পণ্য চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। সময় ও শ্রমের অপচয় কমে আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ব্যবসায়ীদের। এ ছাড়াও রিকশা, রিকশা ভ্যান চালিয়ে বহু সংখ্যক দরিদ্র মানুষ তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। রাস্তা,সেচ-নালা, বরেন্দ্র ভবন, খাল ও পুকুর খনন, বৃক্ষরোপণ, নার্সারী তৈরী প্রভৃতি কাজেও বহু দিনমজুর কাজ পেয়েছে। পাকা রাস্তাকে কেন্দ্র করে মোড়ে মোড়ে অসংখ্য ছোট ছোট দোকান, হোটেল- রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। ছোট ছোট বাজারের সংখ্যাও বেড়েছে। ফলের বাগান তৈরী হবার ফলে গাছ পাহারা দেয়া, বাগানের ফল আহরণ ও বাজারজাত করাসহ সংশ্লিষ্ট কাজেও বহু মানুষ সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। নার্সারী গড়ে তোলাও বেশ আকর্ষণীয় কাজে উন্নীত হয়েছে। এর সঙ্গে অনেকেই জড়িত হয়ে কাজের সংস্থান করে নিয়েছে। কৃষি পণ্য ও উপকরণ নিয়ে গড়ে উঠেছে বহু সংখ্যক মিল-কারখানা। যার মধ্যে রয়েছে ধান,চালের মিল, আটার মিল, অটোমেটিক রাইস মিল, সারের ব্যবসা, ধান-চালের আড়ৎ প্রভৃতি। বহু স্থানে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ার ফলেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক এনজিও ও বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবার ফলেও কর্মসংস্থান বেড়েছে।

www.nagorikpathagar.com

বরেন্দ্রর অনেক স্থানই রয়েছে যেখানে বর্তমানে গড়ে উঠা জীবনযাত্রা এই ক'দিন পূর্বেও কল্পনাতীত ছিল। জীবনধারার এই পরিবর্তনের মূলে কাজ করেছে মানুষের কর্মসংস্থান, জীবিকার উপায় বৃদ্ধি এবং কর্মপরিধির বিস্তার। এসব কিছুই বরেন্দ্রের জীবন চিত্র পাল্টে দিতে সহায়ক হয়েছে বলে মনে করছেন সমাজ বিশেষজ্ঞরা।

সুবাসিত চালের মোহনীয় গন্ধে ভরপুর থাকে মাঠ
কৃষক হচ্ছে আর্থিকভাবে লাভবান

এক সময় বরেন্দ্রের গৌরব ও আভিজাত্যের প্রতীক ছিল বিচিত্র নাম ও আকারের ধান। কাটারী ভোগ,চিনি আতপ, কালিজিরা, চিনিগুড়া, বাসমতি, জেসমিন, খাসকানি, রাঁধুনীপাগল, বিরই প্রভৃতি সুগন্ধি জাতের এবং ঝিঙ্গাশাইল, শাহী বালাম, কদমশাইল, নাজির শাইল, দাদখানি, মোহিনী, প্রগতি, লতা শাইল প্রভৃতি সরু জাতের ধানের নাম মানুষ্ প্রায় ভুলেই গেছে। উচ্চফলনশীল জাতের ধানের কাছে এসব সরু ও সুগন্ধি চাল ঐতিহ্য হারাতে বসেছিল। এখন সেই গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলেছে বরেন্দ্র এলাকা জুড়ে। এখন আবাদ মওসুমে এসব সুবাসিত ধানের মোহনীয়গন্ধে ভরপুর থাকে কৃষকের জমি। সেই সঙ্গে উৎফুল্ল থাকে কৃষকের মন।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কৃষকের অর্থনৈতিক লাভের কথা ভেবে এবং দেশকে বিশ্ববাজার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ করে দিতে সরু ও সুগন্ধি চালের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বিশেষ প্রকল্প নিয়েছে। এর আগে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত গৃহীত একটি প্রকল্পে ১ কোটি ৩৭লাখ টাকার বেশী ব্যয় করা হয়। এই অর্থে বীজ ক্রয় ও বিতরণ, কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট তৈরী এবং সেমিনার ও কর্মশালা করা হয়। প্রকল্পটি নতুন করে ২০০৪-২০০৯ সাল নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে ৩৫টি প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছে। কৃষক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও রফতানিকারক, কৃষিবিদ প্রভৃতির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত অর্থ বছর পর্যন্ত এসব কাজে ব্যয় হয়েছে ৪১ লাখ টাকা। সরু চাল উৎপাদন ও বিপণন প্রকল্প নামে এই কার্যক্রমের আওতায় এদফা বাসমতি চালকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। একজন কর্মকর্তা জানান, কৃষকরা বৃষ্টিনির্ভর চিনি আতপ ধান আবাদে অভ্যস্ত ছিল। যাতে বিঘা প্রতি মাত্র ৫/৬ মণ ধান পাওয়া যেতো। এখন নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদান, যথাযথ জমি নির্বাচন ও বাণিজ্যিক ভিত্তিকে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে ৮/১০ মণ পর্যন্ত উৎপাদিত হচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তানী উৎপাদিত বাসমতি ধানের আবাদ সঠিকভাবে এবং ইরি-বোরা মওসুমে করলে ২০/২৫মণ পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। তিনি জানান, এ বছর চিনি আতপ ও বাসমতি ধানের জন্য ২৫টি উপজেলায় ২৫টি প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছে। তিনি জানান, বিশ্ববাজারে কেবল বাসমতি চাল রফতানি হয় ৩০ লাখ মেট্রিক টন। যা প্রধানতঃ ভারত ও পাকিস্তান দখল করে আছে। এবার সরু চাল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের নিয়ে সমিতি করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া সরু ও সুগন্ধি

www.nagorikpathagar.com

রয়েছে তা অনায়াসেই বাংলাদেশ দখল করতে পারে-যদি চালের গ্রেড যথাযথ করা যায়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাই ছিল মিলে ধান ভাঙ্গানো ও গ্রেডিং করে তা প্যাকেটজাত করা। সাম্প্রতিককালে এসব সমস্যা অনেকাংশ দূর হয়েছে এবং রফতানিকারক সৃষ্টি হবার ফলে এর সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে বরেন্দ্র অঞ্চলে সরু ও সুগন্ধি চালের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

এতোদিন কৃষকদের জন্য সমস্যা ছিল পর্যাপ্ত বাজার না পাওয়া। কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদিত চালের চাহিদা পূরণ করতে গেলে কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন খাদ্যজাত উন্নতমানের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় অভ্যন্তরেও এর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষককে আর দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় না উৎপাদিত ধান নিয়ে। বরেন্দ্রের অনেক মানুষ দিন বদলের আশায় এখন সরু চাল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে জানা গেছে।

যুগযুগ ধরে বঞ্চিত মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করছে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ

বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন করে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত মানুষের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করতে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রসহ সকল মহলের ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করেছেন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ড.এম আসাদ উজ্জামান। আগামী উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বরেন্দ্রের পরিবেশের আমুল পরিবর্তন ঘটবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ড.এম আসাদ উজ্জামান এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এ ব্যাপারে সরকারের সহায়তা বরেন্দ্রের মানুষকে আরো উজ্জীবিত করে তুলেছে। ড. আসাদ উজ্জামান বরেন্দ্র প্রকল্পের সূচনা থেকেই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুধু তাই নয়, এই বিপুল কর্মকান্ডের মূল আইডিয়া তারই। তাঁকে এর রূপকারও বলা হয়ে থাকে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ১৯৭২ সাল থেকে প্রকৌশলী হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজের অভিজ্ঞতাসহ ১৯৭৭ সালে তৎকালীন বিএডিসির সেচ বিভাগে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে সরকারী কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি বরেন্দ্র প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ১৯৯২ সালে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হলে এর নির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত হন। বিগত সরকারের আমলে তাঁকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়। তবে এ সময় ভূ-গর্ভস্থ পানি বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক ওয়েষ্টার্ন ইউনিভারসিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০২ সালে তিনি পুনরায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। পানি সম্পদ বিষয়ে তাঁর বহু গবেষণা নিবন্ধ দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এ সংক্রান্ত দেশী-বিদেশী অসংখ্য সেমিনারে ও কর্মশালায় তিনি যোগদান করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বেশ কিছু কৃষি ও প্রকৌশল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী

www.nagorikpathagar.com

উপজেলার কেলা বারইপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা স্কুল শিক্ষক (মরহুম) ফহিমউদ্দীন বিশ্বাস ও মাতা আনোয়ারা বেগম। মা তার ৮ পুত্র ও ১ কন্যার কৃতিত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে রত্নগর্ভা পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রশ্নঃ বরেন্দ্র অঞ্চলে গত দু'দশকে মানুষের জীবনমানের কী পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?

উত্তরঃ ১৯৮৫ সালের পূর্বে অর্থাৎ বরেন্দ্র প্রকল্প গঠিত হবার আগে বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেতরের গ্রামগুলোতে কৃষিজীবী মানুষেরা বছরে একটি মাত্র ফসল আমন-যা বৃষ্টিনির্ভর-নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। এই ফসল তাদের বছরে বড়জোর ৪ মাস কর্মসংস্থান করতো। বাকী সময় কাটতো বেকার। এখন বেশীর ভাগ স্থানেই বছরে ২ থেকে ৩টি পর্যন্ত ফসল হচ্ছে।

ফলে এখন মানুষ কাজ পেয়েছে। সাঁওতাল উপজাতি এবং অন্যান্য দূরের জেলাগুলো থেকে মানুষ কাজ করতে এসে সারাবছর কাজ পাচ্ছে। আগে এই অঞ্চলের মানুষ সিলেটসহ দূরবর্তী বিভিন্ন জেলায় মাটি কাটা ও ইটভাটার কাজে যেতো এবং বছরের বেশীর ভাগ সময় কাটাতো। এখন এই চিত্র উল্টে গেছে। গ্রামে গেলে মানুষের সচ্ছলতা চোখে পড়ে। শহরের কিছু সুবিধা গ্রামে বসে পাচেছ বলে তারা আর শহরমুখী হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য গ্রাম থেকে শহরে পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে। এই একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্নঃ কৃষি ও পরিবেশেগত উন্নয়নে আগামীতে আর কী কী পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তরঃ কতটা পানি কম ব্যবহার করে কতটা বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায়, সে চিন্তাভাবনা এখন করা হচ্ছে। শুধু ধান নয়, বিভিন্ন অর্থকরী ফসল যেমন আলু, টমেটো প্রভৃতি উৎপাদনের দিকে জোর দেয়া হয়েছে। যাতে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয়। এছাড়া গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবার ফলে বরেন্দ্রের রুক্ষতা ও মরুময় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এ ছাড়া বনায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত ৫২ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রকল্প একনেক-এ পাস হবার অপেক্ষায় রয়েছে। এর আওতায় ৮০ লাখ গাছ লাগানো হবে, যার শতকরা ৮০ ভাগ ফলদ। বাকী থাকবে বরেন্দ্র অঞ্চল দেশের অন্যতম সুশীতল ভূমি।

প্রশ্নঃ বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে গভীর নলকূপ চালু করা ছাড়া আর কী পরিকল্পনা রয়েছে?

উত্তরঃ এই অঞ্চল খুব সম্প্রতি বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতায় এসেছে। বিদ্যমান গভীর নলকূপসমুহ চালু করা ছাড়াও সেচনালা নির্মাণ বর্তমান চালু প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। এই অঞ্চলের ১ হাজার ২১৭টি গভীর নলকুপের প্রতিটিতে ২৫হাজার ফুট দীর্ঘ সেচনালা নির্মাণ করা হবে। এ জন্য ৯৭কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এ ছাড়া গভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পানির অপচয়রোধে গভীর নলকুপ থেকে জমিতে ঝর্ণার মতো (স্প্রিংকলার) পানি ছিটানো একটি প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। এই এলাকায়

www.nagorikpathagar.com

চাল যাতে মিলে সঠিক মানে ভাঙ্গানো ও পরিচ্ছন্ন করা যায় সে জন্য কৃষকদের নিয়ে সমিতি করে দেয়া এবং মিলকে সরু চাল ভাঙ্গানোর উপযোগী প্রযুক্তি সম্পন্ন করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে একদিকে কৃষক তাদের উৎপাদিত ধান নিয়ে বেকায়দায় পড়বে না, ভাঙ্গানোর জন্য মিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা খুঁজে পাবে- সেই সঙ্গে রফতানিকারকদের কাছেও চাল পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এভাবে কৃষক, মিলার ও রফতানিকারকদের মধ্যে একটি সমন্বয় ও সেতুবন্ধন গড়ে তোলা হচ্ছে।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সূত্রে জানা গেছে, দেশে সরু ধানের উৎপাদন মোটামুটি ৬লাখ মেট্রিক টন। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে এর চাহিদা ১০ লাখ ও ৫০ হাজার টন। সারারিশ্বে এর চাহিদা ২৫ লাখ টনের মতো। ভারত বর্তমানে বাসমতি চাল রফতানি করে ৫ লাখ টনের বেশী। পাকিস্তান করে ৭ লাখ টনের মতো। চীন ১০ লাখ টন জেসমিন চাল থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করে থাকে। এভাবে দেখা যায়, সারাবিশ্বে সরু ও সুগন্ধি চালের যে বিরাট বাজার রয়েছে তা অনায়াসেই বাংলাদেশ দখল করতে পারে-যদি চালের গ্রেড যথাযথ করা যায়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাই ছিল মিলে ধান ভাঙ্গানো ও গ্রেডিং করে তা প্যাকেটজাত করা। সাম্প্রতিককালে এসব সমস্যা অনেকাংশ দূর হয়েছে এবং রফতানিকারক সৃষ্টি হবার ফলে এর সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে বরেন্দ্র অঞ্চলে সরু ও সুগন্ধি চালের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

এতোদিন কৃষকদের জন্য সমস্যা ছিল পর্যাপ্ত বাজার না পাওয়া। কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদিত চালের চাহিদা পূরণ করতে গেলে কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন খাদ্যজাত উন্নতমানের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় অভ্যন্তরেও এর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষককে আর দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় না উৎপাদিত ধান নিয়ে। বরেন্দ্রের অনেক মানুষ দিন বদলের আশায় এখন সরু চাল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে জানা গেছে।

যুগযুগ ধরে বঞ্চিত মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করছে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ

বৃহত্তর বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন করে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত মানুষের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করতে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রসহ সকল মহলের ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করেছেন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ড.এম আসাদ উজ্জামান। আগামী উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বরেন্দ্রের পরিবেশের আমুল পরিবর্তন ঘটবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।
এই লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ড.এম আসাদ উজ্জামান এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এ ব্যাপারে সরকারের সহায়তা বরেন্দ্রের মানুষকে আরো উজ্জীবিত করে তুলেছে। ড. আসাদ উজ্জামান বরেন্দ্র প্রকল্পের সূচনা থেকেই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুধু তাই নয়, এই বিপুল কর্মকান্ডের মূল আইডিয়া তারই। তাঁকে এর রূপকারও বলা হয়ে থাকে। কৃষি

www.nagorikpathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ১৯৭২ সাল থেকে প্রকৌশলী হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজের অভিজ্ঞতাসহ ১৯৭৭ সালে তৎকালীন বিএডিসির সেচ বিভাগে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে সরকারী কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি বরেন্দ্র প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ১৯৯২ সালে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হলে এর নির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত হন। বিগত সরকারের আমলে তাঁকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়। তবে এ সময় ভূ-গর্ভস্থ পানি বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক ওয়েষ্টার্ন ইউনিভারসিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০২ সালে তিনি পুনরায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। পানি সম্পদ বিষয়ে তাঁর বহু গবেষণা নিবন্ধ দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এ সংক্রান্ত দেশী-বিদেশী অসংখ্য সেমিনারে ও কর্মশালায় তিনি যোগদান করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বেশ কিছু কৃষি ও প্রকৌশল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার কেল্লা বারইপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা স্কুল শিক্ষক (মরহুম) ফহিমউদ্দীন বিশ্বাস ও মাতা আনোয়ারা বেগম। মা তার ৮ পুত্র ও ১ কন্যার কৃতিত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে রত্নগর্ভা পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রশ্নঃ বরেন্দ্র অঞ্চলে গত দু'দশকে মানুষের জীবনমানের কী পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?

উত্তরঃ ১৯৮৫ সালের পূর্বে অর্থাৎ বরেন্দ্র প্রকল্প গঠিত হবার আগে বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেতরের গ্রামগুলোতে কৃষিজীবী মানুষেরা বছরে একটি মাত্র ফসল আমন-যা বৃষ্টিনির্ভর-নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। এই ফসল তাদের বছরে বড়জোর ৪ মাস কর্মসংস্থান করতো। বাকী সময় কাটতো বেকার। এখন বেশীর ভাগ স্থানেই বছরে ২ থেকে ৩টি পর্যন্ত ফসল হচ্ছে।

ফলে এখন মানুষ কাজ পেয়েছে। সাঁওতাল উপজাতি এবং অন্যান্য দূরের জেলাগুলো থেকে মানুষ কাজ করতে এসে সারাবছর কাজ পাচ্ছে। আগে এই অঞ্চলের মানুষ সিলেটসহ দূরবর্তী বিভিন্ন জেলায় মাটি কাটা ও ইটভাটার কাজে যেতো এবং বছরের বেশীর ভাগ সময় কাটাতো। এখন এই চিত্র উল্টে গেছে। গ্রামে গেলে মানুষের সচ্ছলতা চোখে পড়ে। শহরের কিছু সুবিধা গ্রামে বসে পাচ্ছে বলে তারা আর শহরমুখী হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য গ্রাম থেকে শহরে পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে। এই একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্নঃ কৃষি ও পরিবেশেগত উন্নয়নে আগামীতে আর কী কী পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তরঃ কতটা পানি কম ব্যবহার করে কতটা বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায়, সে চিন্তাভাবনা এখন করা হচ্ছে। শুধু ধান নয়, বিভিন্ন অর্থকরী ফসল যেমন আলু, টমেটো প্রভৃতি উৎপাদনের দিকে জোর দেয়া হয়েছে। যাতে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয়। এছাড়া গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবার ফলে বরেন্দ্রের রুক্ষতা ও মরুময় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এ ছাড়া বনায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত ৫২ কোটি টাকা ব্যয়

www.nagorikpathagar.com

সাপেক্ষ একটি প্রকল্প একনেক-এ পাস হবার অপেক্ষায় রয়েছে। এর আওতায় ৮০ লাখ গাছ লাগানো হবে, যার শতকরা ৮০ ভাগ ফলদ। বাকী থাকবে বরেন্দ্র অঞ্চল দেশের অন্যতম সুশীতল ভূমি।

প্রশ্নঃ বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে গভীর নলকূপ চালু করা ছাড়া আর কী পরিকল্পনা রয়েছে?

উত্তরঃ এই অঞ্চল খুব সম্প্রতি বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতায় এসেছে। বিদ্যমান গভীর নলকূপসমূহ চালু করা ছাড়াও সেচনালা নির্মাণ বর্তমান চালু প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। এই অঞ্চলের ১ হাজার ২১৭টি গভীর নলকুপের প্রতিটিতে ২৫হাজার ফুট দীর্ঘ সেচনালা নির্মাণ করা হবে। এ জন্য ৯৭কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এ ছাড়া গভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পানির অপচয়রোধে গভীর নলকুপ থেকে জমিতে ঝর্ণার মতো (স্প্রিংকলার) পানি ছিটানো একটি প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। এই এলাকায় আরো ২টি প্রকল্প রয়েছে। যার একটিতে রয়েছে ১৩টি জেলার ৩৬টি উপজেলার প্রতিটিতে ১০কিলোমিটার করে ফিডার রোড নির্মাণ এবং প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে খরা প্রবণ এলাকায় বৃক্ষরোপণ। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় ১৫ লাখ গাছ লাগানো হচ্ছে। যা একনেকে অনুমোদনও পেয়েছে। এই সঙ্গে গভীর নলকূপগুলোয় বিদ্যুতায়নের কাজও চলছে।

প্রশ্নঃ বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের পরিধি সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে জনশক্তির সম্প্রসারণ ঘটছে না। এতে সমস্যা হচ্ছে কি না? কর্তৃপক্ষের আর্থিক সংকট আছে কি?

উত্তরঃ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা আছে সরকার কোন জনবল সরবরাহ করবে না। এ জন্য সতর্কতার সঙ্গে বিদ্যমান জনশক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে। পিক পিরিয়ডের (জানুয়ারী-জুন) জন্য খন্ডকালীন লোক নিয়োগ করে এবং আয়ের উপর ভিত্তি করে কাজে লাগানো হচ্ছে। এ ছাড়া অর্থের এমন সংকট নেই, যে কারণে কাজ বন্ধ থাকতে পারে।

(রচনাকালঃ সেপ্টেম্বর,২০০৫)

www.nagorikpathagar.com

বরেন্দ্র পরিবেশ উন্নয়নে বিএমডিএ'র ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলবর্তী বিশেষ ভূমি বৈশিষ্ট্য মন্ডিত বরেন্দ্র ভূমি নানা কারণে আলোচিত হলেও গবেষক বিশেষজ্ঞদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ এর পরিবেশ। সময়ের একটি পর্যায়ে বিশেষ করে এর প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল রীতিমত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয়। শুধু মরু সদৃশ প্রাকৃতির জন্য নয়, এই এলাকার সার্বিক আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতা ছিল উলেখ করার মতো। অথচ এর উন্নয়নে ছিল বিপুল সম্ভাবনাও। একটি সুসমন্বিত পরিকল্পনা, কার্যকর পদক্ষেপ এবং কিছু আর্থিক সঙ্গতি পুঁজি করে এগিয়ে গেলে এর পরির্তন সম্ভব। সেটা মরু করণের কবল থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপার হোক, অথবা জীবন মানের উন্নয়নের ক্ষেত্র হোক।

এই পটভূমিকে সামনে রেখে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পকে পরিবেশ উপযোগীভাবে বাস্তবায়নকে গুরুত্ব প্রদানে সচেষ্ট হয়। সে প্রেক্ষিতে গৃহীত হয় বিবিধ কার্যক্রম। এতে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাধীন টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (এসইএমপি)। বিগত প্রায় এক দশক জুড়ে বৃহত্তর রাজশাহীর ২৫ টি উপজেলায় এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও কার্যকর প্রকল্প হিসাবে 'পরিবেশ উন্নয়নে ইকোভিলেজ' শীর্ষক কর্মকান্ড চলছে বরেন্দ্র অঞ্চলে। যা ইতোমধ্যে বৃহত্তর বরেন্দ্র ভূমির প্রকল্প এলাকার মানুষের সার্বিক জীবনমানের অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

বরেন্দ্রের পরিবেশ সমস্যা ঃ

বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাকৃতিক ও মানব জীবনের সঙ্গে সংশিষ্ট পরিবেশের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা বিরাজমান তা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে দীর্ঘ দিন ধরে। এসব সমস্যার তালিকা এতো দীর্ঘ যে এগুলোর সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ বহুমাত্রিক শুধু নয়, দীর্ঘমেয়াদী, কারিগরী ও প্রযুক্তিগত ব্যাবস্থাপনা সম্বলিত, খানিকটা ব্যয় বহুল এবং আইনগত জটিলতা সম্পৃক্ত। তথাপি বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতেই হবে - এই দৃঢ় সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে।

চিহ্নিত সমস্যাগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে, খরা, অসময়োচিত বৃষ্টিপাত, বৃক্ষ

www.nagorikpathagar.com

নিধন, জলাবদ্ধতা ও পানি দূষণ, জমির উর্বরতা হ্রাস পাওয়া, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিষের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, অপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা, অসময়ে বন্যা, ভূ-পৃষ্টের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, ভূ-উপরিস্থ পানির সুষম ব্যবহার না হওয়া ও পানির ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি, নদী ভরাট ও নাব্যতা হ্রাস পাওয়া, নদী ভাঙ্গন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, পশু, পাখি, মাছ ও বৃক্ষের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাওয়া, অপরিকল্পিতভাবে উচ্চফলনশীল ফসল ও মাছের চাষ বৃদ্ধি, শস্য পর্যায় মেনে না চলা, কলকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, অপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা, অপরিকল্পিত ইটভাটা, পাকা অবকাঠামো - যথা বাড়িঘর ও রাস্তার জন্য চাষের জমি হ্রাস পাওয়া, তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্য, পদ্মাসহ বিভিন্ন নদীতে বাঁধ নির্মাণ, পরিবেশ বিরূপ বাঁধ ও রেগুলেটর নির্মাণ, বিভিন্ন খাদ্যপন্যে কৃত্রিম রাসায়নিক মেশানো, পরিচ্ছন্নতার অভাব, দারিদ্র ও অশিক্ষার ব্যাপকতা প্রভৃতি।

উপরোক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কতগুলো বেসিক কার্যক্রম হাতে নেয়া জরুরী হয়ে পড়ে। একটি সমস্যার সমাধান হলে অন্য ৫/১০ টি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এমন দৃষ্টিভঙ্গীকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ ভূক্তভোগীরা কিছু সমাধানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর মধ্যে বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ সমুহ উলেখ করা হয়েছে ঃ

১। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ ঃ অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ ও মৎস্য চাষের উন্নয়নকল্পে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলের সমস্ত বড় বড় পুকুর, খাল, বিল পুনঃখনন প্রয়োজন।

২। নদীমুখ পুনঃখনন ঃ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলার কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অবস্থার অবনয়ন রোধ করার লক্ষ্যে বড়াল নদীর নিম্নমুখে আনুমানিক অর্দ্ধ কিলোমিটার ভরাট হয়ে যাওয়া অংশ পুনঃখনন প্রয়োজন। প্রকল্পটি গৃহীত হলে কৃষক, নদীপথ ব্যবহারকারী জনসাধারণ এবং মৎস্যজীবীরা উপকৃত এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে।

www.nagorikpathagar.com

৩। সাপাহার উপজেলায় পানি সরবরাহের উৎস হিসাবে জবই বিল ঃ জবই বিলে উন্নয়নমুলক কাজ চলছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে জবই বিল থেকে সাপাহার উপজেলা সদরে পানীয় জল, গোসলের পানি ও সেচের পানি সরবরাহ করা যেতে পারে। ২০ ফুট উচ্চতায় নির্মিত সংরক্ষণাগারে পানি উঠিয়ে ১০ - ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী উপজেলা সদরে পানি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৪। গোষ্ঠী ভিত্তিক বিল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঃ গোষ্ঠী ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ চাষকে প্রাধান্য দিয়ে মাছ সহ অন্যান্য জলচর প্রাণীর চাষ, কৃষি কাজ ও গৃহপালিত প্রাণীর খামার গঠনের জন্য জলাশয়গুলি ব্যবহার করা উচিত। গোমস্তাপুর, ভোলাহাট ও পোরশা উপজেলার খাস-খতিয়ানভূক্ত বিলগুলির দূরবর্তী উপজেলা সদরে পানি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৫। ভূমির উর্বরতা রক্ষা ঃ সমন্বিত পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব শস্য উৎপাদন, জৈব বর্জ্য পচন এবং ঘাস ও অন্যান্য উদ্ভিদ রোপনের মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় হ্রাস করে ভূমির উর্বরতা রক্ষা করা যেতে পারে।

৬। কেঁচো চাষ ও কেঁচোর কম্পোস্ট ঃ কেঁচোর বিভিন্ন প্রজাতি চাষ করে হাঁস-মুরগীর খাদ্য ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭। উদ্ভিদ রোগ নিরাময়ের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ঃ হঠাৎ নিম্ন তাপমাত্রাজনিত কারণে রাজশাহী জেলার মোহনপুরে পানগাছ এবং ইগউঅ এর আওতাধীন অঞ্চলের অন্যত্র নারিকেল গাছের মড়ক নিরোধ করার জন্য বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

৮। বনায়ন কর্মসূচী ঃ দেশী-বিদেশী বহু প্রজাতিভিত্তিক ফলপ্রদানকারী বৃক্ষ, পুরুপাতা বিশিষ্ট বৃক্ষ, উঁচু বৃক্ষ এবং ভেষজ উদ্ভিদের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত ভাবে, সামাজিক

www.nagorikpathagar.com

পর্যায়ে এবং সরকারী পর্যায়ে বাড়ীর চারপাশে, স্কুলে-কলেজ-মাদ্‌রাসার পতিত জায়গায়, রাস্তা ও রেলপথের উভয় পার্শ্বে সবুজ বেষ্টনী ও নদীর পাড়ে নিবিড় বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের দেশে ১ কোটি ১২ লক্ষ একর জমিতে আমবাগান রয়েছে।

৯। মৎস্য সংরক্ষণাগার ঃ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষ বৃদ্ধির জন্য পোনা মাছের উৎপাদন ক্ষেত্র বৃদ্ধি প্রয়োজন। অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মাছের অভয়ারণ্য (sanctuary) গড়ে তোলা অবশ্যই প্রয়োজন। সংরক্ষিত এলাকায় প্রজনন ঋতুতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ বাঞ্চনীয়।

১০। ইকো পার্ক ঃ ইকো পার্ক নির্মাণের ব্যাপারে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই কিছু কিছু কাজ করেছে। প্রকল্পটির সম্প্রসারণ করে প্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষা ও বিনোদনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১১। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা বর্দ্ধন ঃ বিনা মূল্যে, স্বল্প মূল্যে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিম্ন সুদে ঋণের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কাছে স্যানিটারী পায়খানা সরবরাহ করা প্রয়োজন। সমবায়ের মাধ্যমে পণশৌচাগার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যায়। BMDA স্বল্প মূল্যে পরিবেশ বান্ধব স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। Urine diverting toilet এর মল বায়োগ্যাসের উৎস এবং কম্পোস্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

১২। আয় উৎপাদক কর্মকান্ড (IGA) ঃ আয় বৃদ্ধির জন্য প্রচুর ক্ষেত্র সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। মৌমাছি পালন, লাক্ষা চাষ, রেশম চাষ, খাস ও পরিত্যক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষ, খয়ের উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে আয় উৎপাদক কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। আধা-স্যানিটারী পায়খানা ও তুষের ব্লক নির্মাণ কারখানা স্থাপনের মাধ্যমেও আয়-উৎপাদক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব। এছাড়া BMDA এর সাম্প্রতিক

www.nagorikpathagar.com

কর্মসূচীর মাধ্যমে সৌখিন উদ্ভিদ ও প্রাণী চাষ চালু করা যায়।

১৩। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ ঃ উপজেলা পর্যায়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অবকাঠামো রয়েছে। সেচের পানি ও অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণীর সাথে BMDA -এর কর্মচারীদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। যদি তাঁরা আরো কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারীর মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণকে বিভিন্ন কমিটি গঠন, স্যানিটেশন, ভূমি ব্যবহার, বৃক্ষ রোপন, দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন তাহলে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়।

সেমপ এর কার্যক্রম ঃ

বরেন্দ্র অঞ্চলের ২৫ টি (রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ) উপজেলা প্রাথমিক ভাবে পরিবেশ রক্ষা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (SEMP)। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP)-র অর্থ সহায়তায় এই কর্মসূচী চালু হয় ১৯৯৯ সালে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০০৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ৪ কোটি টাকার বেশী ব্যয়ে ৮ লাখ গাছের চারা, ৫০ টি পুকুর পুনঃখনন, ১৫০০ মিনি পুকুর খনন, ২০০ কম্পোষ্ট সার প্রদর্শনী ও ৬ হাজার ৫শ কেজি সবুজ সারের জন্য ধইঞ্চা বীজ সরবরাহ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে কঠোর প্রকৃতির এলাকা বলে পরিচিত নাচোল, গোমস্তাপুর, সাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুর উপজেলায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

ইকোভিলেজ প্রতিষ্ঠা ঃ

বরেন্দ্রে আধুনিক সময়ের আকর্ষণীয় ও কার্যকর পরিবেশ কর্মসূচী হলো ইকো ভিলেজ বা পরিবেশ বান্ধব গ্রাম গড়ে তোলা। SEMP-র এই কর্মসূচীর নাম পরিবেশ উন্নয়নে ইকোভিলেজ। এই প্রকল্পের পটভূমি উলেখ করা হয় :- অনাবৃষ্টি, উচ্চতাপমাত্রা, রুক্ষ ও বৈরী প্রাকৃতিক আবহাওয়া, কংকরযুক্ত মাটি বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরিবেশবিদগন এ অঞ্চলের মরুময়তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির এরূপ

www.nagorikpathagar.com

বৈরী মনোভাবের কারণে প্রাচীন কাল থেকেই বরেন্দ্র এলাকার জনগন জীবন ধারণের ন্যুনতম মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অঞ্চলের মরুময়তা রোধকল্পে ও জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ইউএনডিপির অর্থায়নে পরিচালিত এসইএমপি প্রকল্প বরেন্দ্র এলাকার উন্নয়নে আর একটি যুৎসই সংযোজন।

প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ টি উপজেলায় ইকোভিলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। এগুলো হলো, রাজশাহী জেলার তানোর ও গোদাগাড়ী, নওগাঁর পোরশা, সাপাহার, পত্নীতলা ও নিয়ামতপুর এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর, নাচোল ও সদর উপজেলা। এতে যে সকল কার্যক্রম বাস্তাবায়িত হবে তার মধ্যে রয়েছে : (১) আরসিসি ওভারহেড ট্যাংকের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহ, (২) পুকুর পুনঃখনন, (৩) বনায়ন কার্যক্রম, (৪) বায়োগ্যাস প্যান্ট, (৫) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ ও (৬) সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম।

খাবার পানি সরবরাহ কার্যক্রমের সুবিধাদি উলেখ করে বলা হয়েছে, এতে সারা বছরের বিশুদ্ধ খাবার পানির যোগান দেয়া যায়, নির্ভরশীল পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা যায়, সুপেয় পানির ঘাটতি জনিত রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়, গ্রামের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, শ্রম ও সময়ের অপচয় রোধ করা যায়। পানি বিশুদ্ধ হবার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমান পানি প্রাপ্তির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিধায় এ প্রসঙ্গে এর ভূমিকায় উলেখ করা হয়েছে। বরেন্দ্রের এই অঞ্চলের অধিকাংশ উঁচু এলাকায় অন্তর্গত হওয়ায় মাটির পানির স্তর অনেক নীচে চলে যায়। এসময় তারাপাম্প বা সুপার তারাপাম্প ও কাজ না করায় খাবার পানির দুস্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। এ সময় অনেকে ডোবা ও পুকুরের পানি দৈনন্দিন কাজে এমনকি খাবারেও ব্যবহার করে। ফলে এ মওসুমে ডায়ারিয়াসহ নানাবিধ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া হস্তচালিত অনেক নলকূপে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক থাকায় তা মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসাবে কাজ করে। পানির দুস্প্রাপ্যতা এবং আর্সেনিকের প্রভাব হেতু অনেক সময় এক গ্রামের লোককে অন্য গ্রাম থেকেও পানি পরিবহন করে আনতে হয় যা সময় ও কষ্টসাপেক্ষ। এসমস্ত প্রতিকূলতা দূর করে আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ বা কূয়া থেকে পাম্পের মাধ্যমে আরসিসি ওভারহেড ট্যাংকে পানি উত্তোলন করে সারা বছর সুপেয় পানি সরাবরাহ একটি কার্যকর ও যুগোপযোগী পদ্ধতি।

www.nagorikpathagar.com

বরেন্দ্রে পুকুর পুনঃখননের গুরুত্ব উলেখ করে বলা হয়েছে অনাবৃষ্টি, উচ্চতাপমাত্রা, রুক্ষ ও বৈরী প্রকৃতির আবহাওয়ার কারণে প্রাচীন কাল থেকেই বরেন্দ্র এলাকার জনগন জীবন ধারণের ন্যুনতম মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অসমতল ও বন্ধুর প্রকৃতির এই অঞ্চলে পানির উৎসের সংখ্যা অপ্রতুল। ফলে প্রাচীন কালে জনগন বৃষ্টির পানিকে কেবল মাত্র ছোট জলাধার, পুকুর, ডোবা বা খাড়ির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতো। সংস্কারের অভাবে এগুলো হারিয়েছে তার নিজস্ব পানি ধারণ ক্ষমতা। ফলে এগুলো সংস্কার করলে পানির উৎস বৃদ্ধি পায়।

পুনঃখননকৃত পুকুরের সুবিধা উলেখ করা হয়েছে এভাবে ঃ জনসাধারণের গোসলের পানির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়, পুনঃখননকৃত পুকুরে মাছ চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, বালতি দিয়ে পানি তুলে হাঁড়ি, পাতিল, পোষাক পরিচ্ছদ ধোয়ার কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করা যায়, পুকুরের পানি শুষ্ক মওসুমে সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলে প্রয়োজনবোধে পুকুরের পানি ফুটিয়ে খাওয়া যায়, পুকুরের পাড়ে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায় এবং আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়।

বৃক্ষরোপনের উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বৃক্ষ রোপনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যায়, ঔষধী গাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার ঔষধের উপাদান পাওয়া যায়, গাছের ডাল-পালা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গাছ মাটির ক্ষয় রোধ করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গাছ বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলজ গাছ পুষ্টি ও খাদ্যঘাটতি রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বনজ গাছ আসবাবপত্র, গৃহস্থালী ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য, বৃক্ষ ও বন হলো পরিবেশের প্রাণ। এসম্পর্কিত ভূমিকায় বলা হয়েছে, যে কোন দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে মাত্র ১৩ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে। বনাঞ্চলের পরিমান সবচেয়ে কম রাজশাহী বিভাগের কয়েকটি জেলায়। এর মধ্যে নওগাঁ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ উলেখযোগ্য। এই জেলা গুলিতে বৃক্ষরোপন ও বনায়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো এক-পরিবেশের ভারসাম্য আনা এবং দুই- অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়ন।

www.nagorikpathagar.com

বায়োগ্যাস প্যান্ট স্থাপনের গুরুত্ব ও উপযোগিতা বিষয়ে সেম্প এর ভূমিকায় বলা হয়েছে : বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৮০০ জন লোক বসবাস করে যার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী গ্রামাঞ্চলে। অন্যান্য সমস্যার মত জ্বালানী সংকটও আমাদের দেশে অন্যতম প্রধান সমস্যা।

গ্রামে সাধারণত খড়, কুটা, গোবর এবং কাঠ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে করে প্রতিদিন যে ভাবে গাছ কাটা হচ্ছে তাতে করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাব। এছাড়া যে পরিমান গোবর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে তাতে করে জমিতে জৈব সারের স্বল্পতার কারণে ফসল উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজন এমন এক চুলা তৈরী করা যাতে করে আমাদের নিজস্ব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায়। সে কারণেই প্রতিটি ইকো ভিলেজে কমপক্ষে ২ (দুই) টি করে বায়োগ্যাস প্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। উলেখ্য যে সব পরিবারে কমপক্ষে ৮ (আট) টি গরু রয়েছে অথবা ৪ (চার) টি মহিষ অথবা ২ (দুই) টি মহিষ ও ৪ (চার) টি গরু রয়েছে সেই সকল পরিবার এই প্রকল্পের আওতা ভুক্ত হবে।

এবার আমাদের বায়োগ্যাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেয়া প্রয়োজন। বাতাসের অনুপস্থিতিতে জৈব পদার্থ থেকে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাকে বায়োগ্যাস বলে। এ গ্যাস তৈরী করতে গোবর, মানুষের মল, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, কচুরী পানা, রান্না ঘরের গৃহস্থালীর যাবতীয় আবর্জনা ইত্যাদি কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বায়োগ্যাস ব্যবহারে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যায় ঃ

- পরিষ্কার জ্বালানী গ্যাস পাওয়া যায়,
- উন্নতমানের জৈব সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়,
- কম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের তুলনায় বায়োগ্যাস প্যান্ট থেকে প্রাপ্ত সার উৎকৃষ্ট,
- "দূষণমুক্ত" স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় থাকে,
- স্বাস্থ্যগত দিক, পোলিও, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, কেঁচো কৃমি প্রভৃতি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.com

স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সম্পর্কে উলেখ করা হয়েছে ঃ মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করা উচিত। যে পায়খানার প্যানের খুড়িতে পানি থাকে এবং মশা মাছি যাওয়া আসা করতে পারে না ও দুর্গন্ধ ছড়ায় না তাকেই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বলে।

স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সুবিধা ঃ মল বাহিত রোগের (কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, টাইফয়েড ইত্যাদি) বিস্তার রোধ করা যায়। পরিবেশ দুষণের মাত্রা হ্রাস করা যায়। গ্রামের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব। স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা যায়। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরীর সাথে সংশিষ্ট উপকরণ সমূহ তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ রোধ করা যায়।

সোলার হোম লাইটিং সিষ্টেম সম্পর্কে উলেখ করা হয়েছে ঃ সূর্য্যের রশ্মি বা আলো এক প্রকার শক্তি। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তা হ'ল সৌর বিদ্যুৎ বা সোলার এনার্জি। সূর্যের আলোর সাহায্যে উৎপাদিত সৌর বিদ্যুৎ ব্যাটারীতে সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারের পদ্ধতিই সোলার সিষ্টেম নামে পরিচিত। যে সমস্ত এলাকায় গ্রীড লাইনের বিদ্যুৎ নাই সেই সমস্ত এলাকায় সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা ঘরবাড়ী, দোকানপাট, ব্যবসায়িক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহজে ব্যবহার করা যায়।

সৌর বিদ্যুতের সুবিধাগুলো হচ্ছে এতে জ্বালানীর প্রয়োজন হয়না, এতে লোডশেডিংও নেই। ন্যুনতম রক্ষণাবেক্ষণে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিরাপদ, কারণ এই বিদ্যুতে উচ্চ ভোল্টেজ না থাকায় তড়িতাহত হবার আশংকা নেই। এটি শব্দ ও পরিবেশ দূষণ মুক্ত। সূর্য এর শক্তির উৎস ফলে তা অফুরন্ত।

এ পর্যন্ত অগ্রগতি ঃ

এসইএমপি'র কার্যক্রম চালু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত (১৯৯৯-২০০৫) বরেন্দ্রের ২৫ টি উপজেলায় পরিবেশ বিষয়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ঃ

গাছের চারা লাগানো হয়েছে ৫ লাখ ২০ হাজার, তালগাছের বীজ বপন হয়েছে ৩৫ হাজার, পুকুর পুনঃখনন হয়েছে ৪৩ টি, মিনি পুকুর খনন করা হয়েছে ৪৩০ টি, খাল পুনঃখনন হয়েছে সাড়ে ১৬ কিলোমিটার, পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ ১১ টি, কম্পোস্ট সার প্রদর্শনী ১৫৯ টি, ধইঞ্চা বীজ সরবরাহ প্রায় ২৭শ কেজি, হোম লাইটিং ২৩ সেট, বায়োগ্যাস প্যান্ট ২০ টি, ইকোভিলেজ প্রতিষ্ঠা ৯ টি, খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা ১২ টি, মিনি ইকো পার্ক প্রতিষ্ঠা ১ টি, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ৮০টি। এসব কার্যক্রম বাস্ত বায়নে এ পর্যন্ত সাড়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

(রচনাকাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৫)

www.nagorikpathagar.com

পরিবেশ এ্যালবাম

www.nagorikpathagar.com

বরেন্দ্রের যোগাযোগের পূর্বতন চিত্র : প্রকল্প গ্রহণের আগে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল-গোমস্তাপুর সংযোগের পার্বতীপুর আড্ডার ত্রিমোহনী সড়কের দৃশ্য

পোরশা-সাপাহারের রাস্তার চিত্র : ৯০-এর দশক পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.com

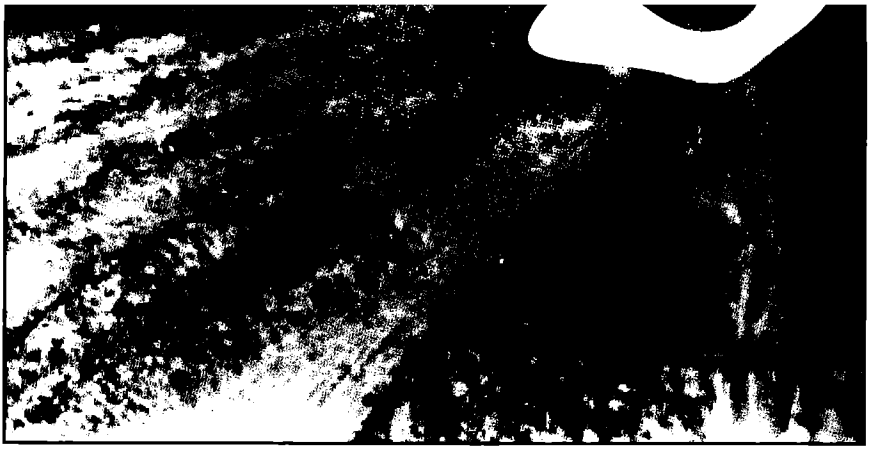

বরেন্দ্র প্রকল্প গ্রহণের আগে নাচোল-পোরশা মহাসড়কের চিত্র

গোদাগাড়ী - নাচোল রাস্তায় গরুগাড়ি ভেঙ্গে এমন বিপন্ন অবস্থায় কৃষককে প্রায়ই পড়তে হতো

www.nagorikpathagar.com

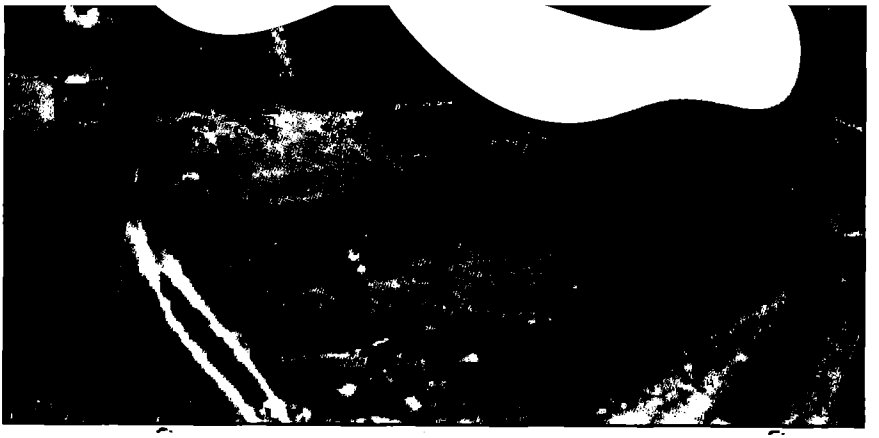

আধুনিক সেচ ব্যবস্থা চালুর আগে বরেন্দ্রে এমন সনাতন পদ্ধতির সেচ ব্যবস্থাই ছিল সাধারণ চিত্র

ফসল মাড়াইয়ের এই পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ ফসল বিনষ্ট হতো। এখন এই চিত্র পাল্টেছে

www.nagorikpathagar.com

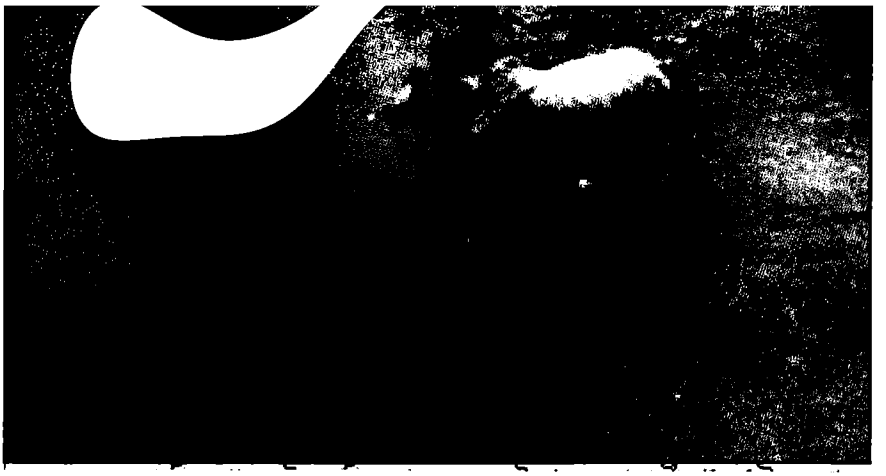

বরেন্দ্রের পানির প্রধান উৎস ছিল পুকুর। একই পুকুরে গবাদী পশু ধৌত করা আর থালা-বাসন কাপড় ধোয়া, গোসল এমনকি খাবার পানিও নেয়া হতো

পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গন অনেক ঐতিহ্যকে করেছে বিলুপ্ত। এমনই একটি ঐতিহাসিক স্থান রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কেল্লাবারুই পাড়ার নবাব আলীবর্দী খাঁর কেল্লা। যা এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত

www.nagorikpathagar.com

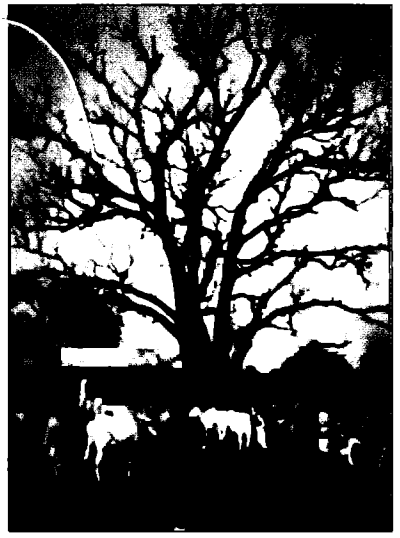

অজ্ঞাত রোগে বৃক্ষের মৃত্যু হচ্ছে

মানুষের পীড়নে পীড়িত বৃক্ষ

বরেন্দ্রে এমন কাঁটা -ঝোপের বিলুপ্তি ঘটছে

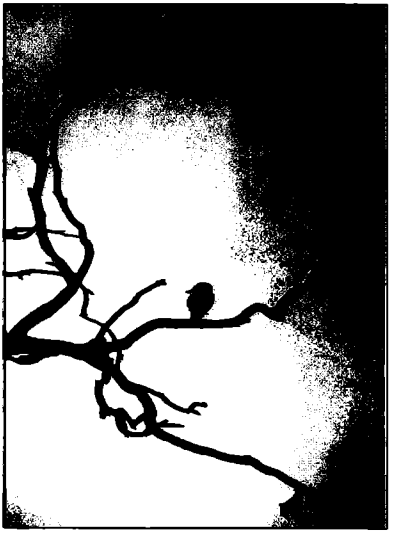

বিপন্ন বৃক্ষে বিষন্ন পাখি

www.nagorikpathagar.com

রাজশাহী মহানগরীতেও সবুজের বিস্তার ঘটছে

বরেন্দ্রে সবুজ প্রকৃতি বিস্তৃত হচেছ

www.nagorikpathagar.com

সারের বদলে গোবর এখন জ্বালানীতে পরিণত হয়েছে

পদ্মা- মহানন্দা- পাগলার ভাঙ্গন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে

www.nagorikpathagar.com

রাসায়নিক- কীটনাশকের কারণে মৎস্য সমপদ ধ্বংস হয়

কৃত্রিম উপায়ে কাঁচা টমেটো পাকা করার দৃশ্য

www.nagorikpathagar.com

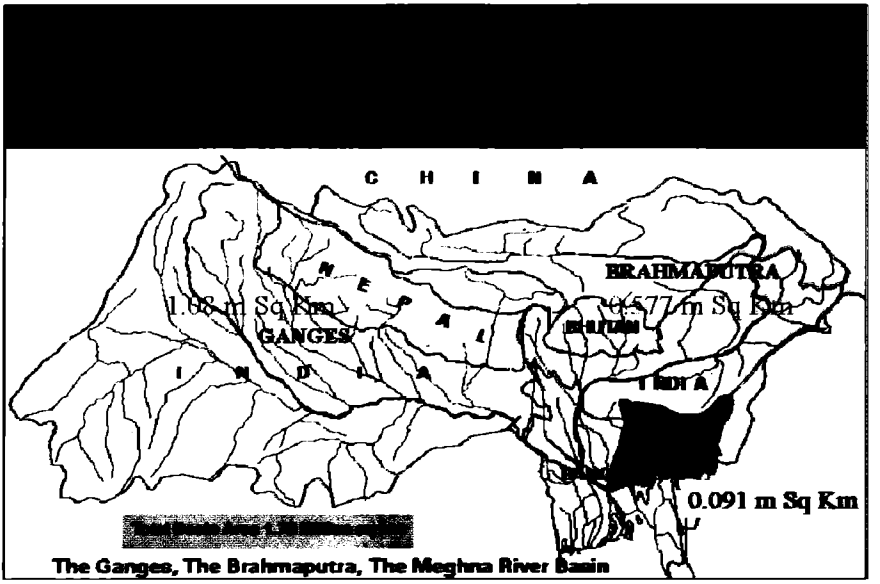

পদ্মা- মেঘনা- যমুনার নেটওয়ার্ক ঃ যা বাংলাদেশেরও প্রাণ

পদ্মা পরিস্থিতি পরিদর্শনে সাংবাদিকদের সঙ্গে রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এম.পি

www.nagorikpathagar.com

পদ্মায় চর পড়ে পড়ে এর ধারা হয়েছে সংকীর্ণ

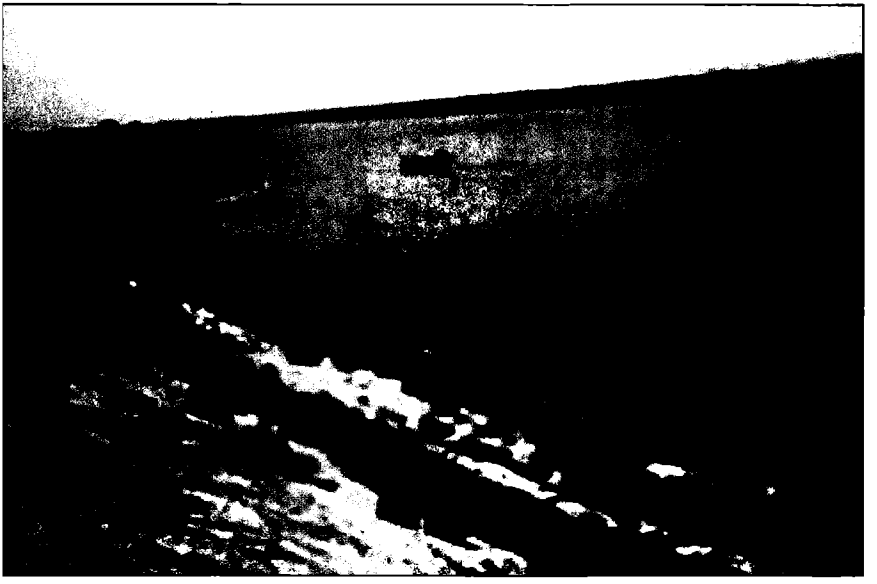

পদ্মার চর বিস্তৃত হলে বিপন্ন হয় পরিবেশ

www.nagorikpathagar.com

ভু-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি খাল খনন প্রকল্প

পদ্মা -মহানন্দা -পাগলার ভাঙ্গন চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিস্তীর্ণ জনপদকে গ্রাস করেছে

www.nagorikpathagar.com

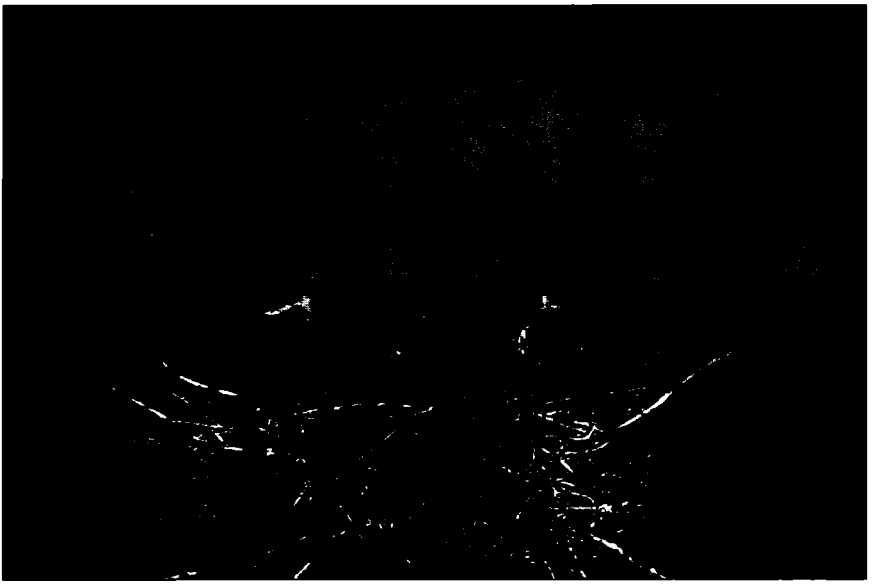

পাখির এমন নিরাপদ আশ্রয় দিনে দিনে দুর্লভ হয়ে আসছে

আবহাওয়ার অসম চিত্র উত্তরের জন্য উদ্বেগজনক

www.nagorikpathagar.com

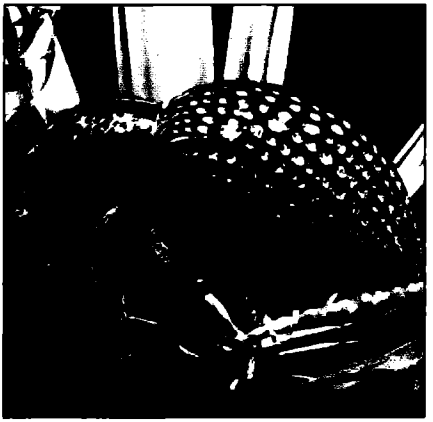

কৃষক বন্ধু লেডি বিটলকে অনেকেই চেনেনা

প্রকৃতির বন্ধু শকুন তেমন একটা দেখা যায়না

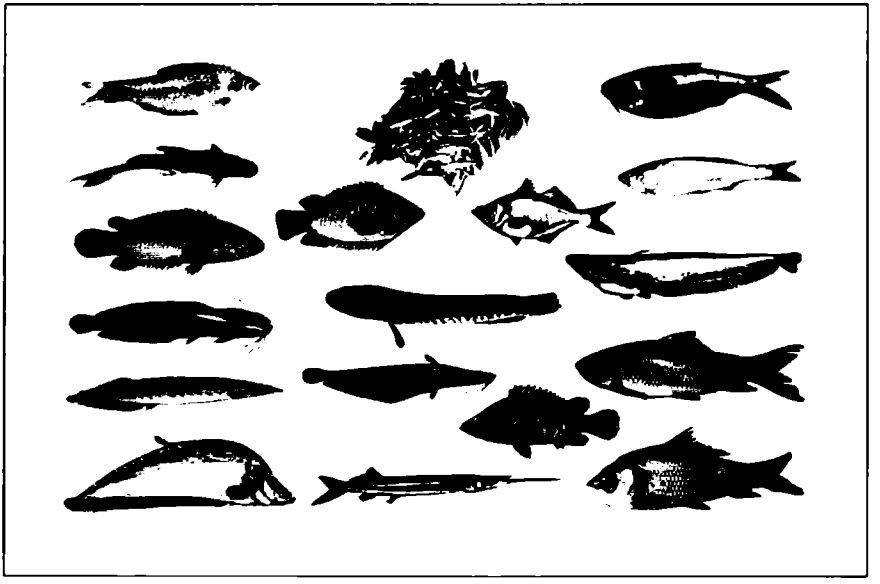

উত্তরাঞ্চলের নদী -খাল- বিল থেকে সুস্বাদু এসব মাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে

www.nagorikpathagar.com

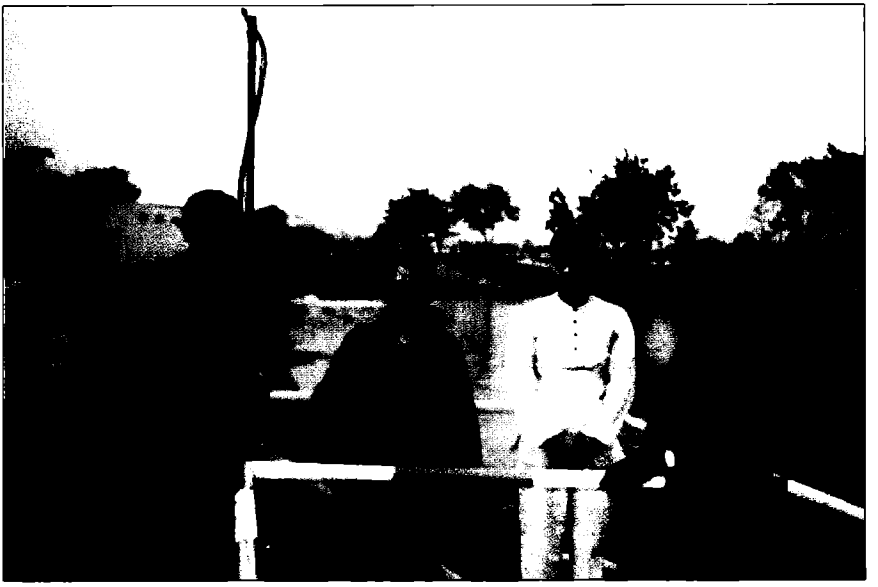

বরেন্দ্রের সেচ মডেল পরিদর্শনে বিদেশী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা
ড. এম. আসাদ উজ জামান (ডানে)

ভূ-গর্ভের পরিবর্তে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহারের একটি মডেল
বরেন্দ্রের সরমংলা খাল

www.nagorikpathagar.com

উত্তরাঞ্চলে ফসলের প্রাণ-প্রবাহ তৈরী করেছে গভীর নলকুপ।
এমন একটি নলকুপের অবস্থা পরিদর্শন করছেন বিএমডিএর নির্বাহী
পরিচালক ড. এম. আসাদ উজ জামান

উত্তরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের এক ভয়াবহ চিত্র

www.nagorikpathagar.com

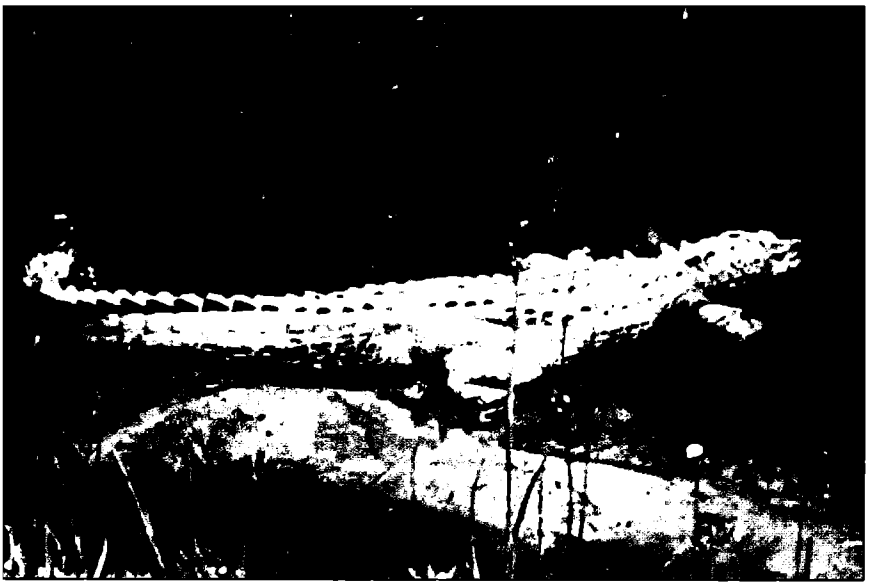

উত্তরাঞ্চলের নদনদী থেকে কুমিরও হারিয়ে গেছে

বরেন্দ্র অঞ্চলে পুকুর-নালার পানি খাবার দিন ফুরিয়েছে।
বাড়ির উঠোনে ট্যাপের বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে গেছে

www.nagorikpathagar.com

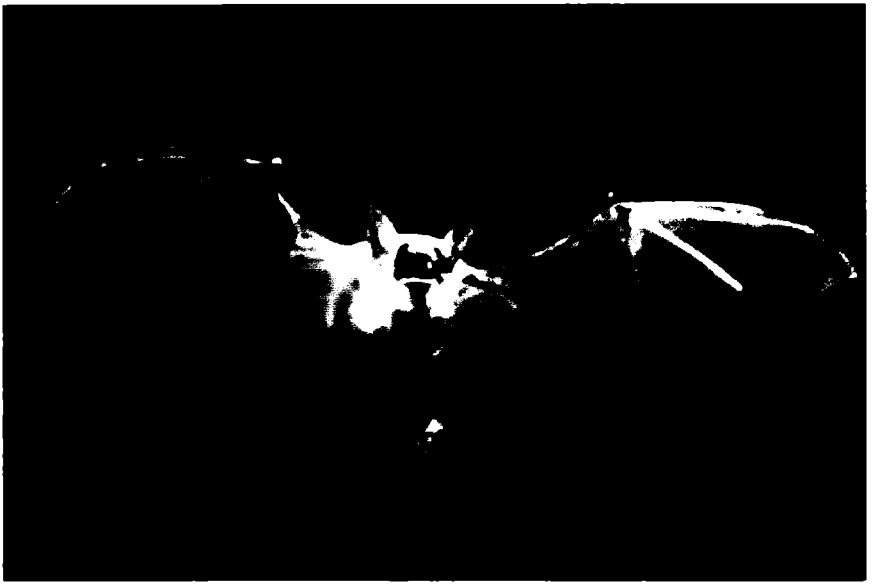

নানান প্রতিকুলতায় টিকে থাকতে পারছেনা নিশাচর প্রাণী বাদুড়

শামুক বিলুপ্ত হচ্ছে

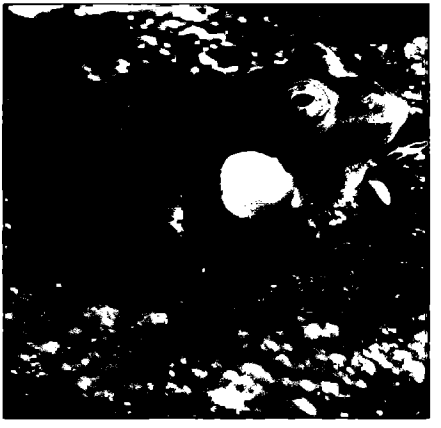

কৃষক -বন্ধু ব্যাঙের অস্তিত্ব বিপন্ন

www.nagorikpathagar.com

পরিবেশ বিষয়ে মেয়র মিজানুর রহমান মিনুর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন লেখক

বরেন্দ্র অঞ্চলে ফসল মাড়াইয়ের আধুনিকরণ হচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

কৃষকের ফসল-বিপ্লব এক আকর্ষণীয় বিষয়। এরই অংশ রাজশাহীর তানোরের নুর মোহাম্মদের শস্য মিউজিয়াম

বরেন্দ্র অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থার যান্ত্রিকরণ হচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

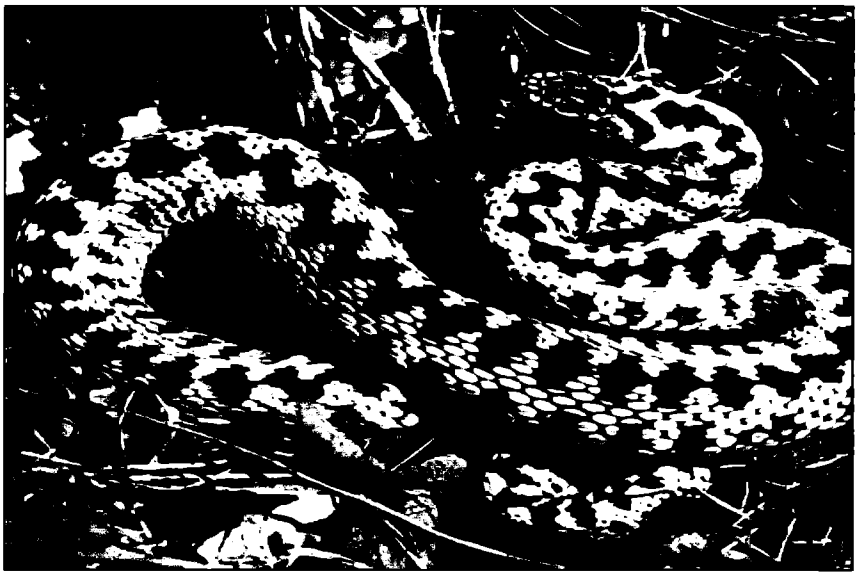

কৃষিজমি বৃদ্ধির ফলে সাপের আস্তানা বিলুপ্ত হবার পথে

রাজশাহী অঞ্চলে উচ্চফলনশীল আমের বাগানে চাষীর সঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞ

www.nagorikpathagar.com

বলাকারা বিপন্ন

জলাশয়ে দুর্লভ সুদৃশ্য পেলিক্যান

দৃষ্টিনন্দন সারসের অস্তিত্ত বিপন্ন

গুঁই সাপ হারাচ্ছে তার ঠিকানা

www.nagorikpathagar.com

বরেন্দ্রের প্রায় সর্বত্র চোখে পড়ে এমন দৃষ্টিনন্দন পাকা সড়ক। যা যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে

বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্রও তলিয়ে যায়

www.nagorikpathagar.com

বরেন্দ্র অঞ্চলে আমের চারা উৎপাদন লাভজনক ব্যবসা

যত্রতত্র ইটভাটা এই অঞ্চলের আমসহ বিভিন্ন ফসলের বাগানগুলোর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়

www.nagorikpathagar.com

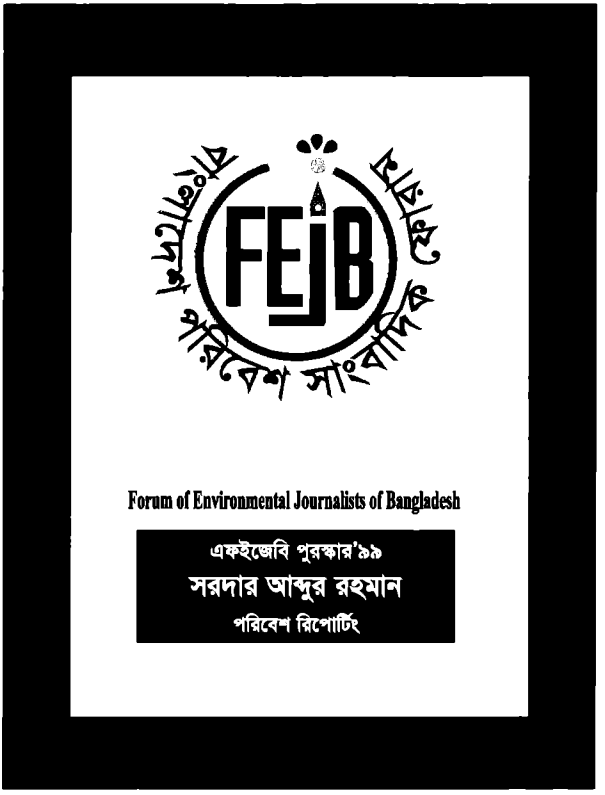

জাতীয় পরিবেশ পুরস্কারের ক্রেস্ট

প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচেছ মনোহর পাখিরা

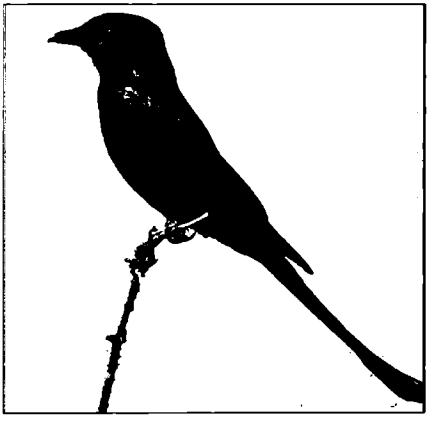

ঠিকানা হারাচেছ কৃষক বন্ধু ফিঙ্গে

www.nagorikpathagar.com

নদী গ্রাস করছে মানুষের ঠিকানা

হরিনের আশ্রয় এখন চিড়িয়াখানায়

উত্তরাঞ্চলে বায়োগ্যাস প্রকল্প জ্বালানী সাশ্রয় ঘটিয়েছে। এক কিষাণী বধূকে বায়োগ্যাস চুলায় রান্না করতে দেখা যাচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

কৃষিতে যান্ত্রিক পদ্ধতি এখনও জনপ্রিয় হয়নি

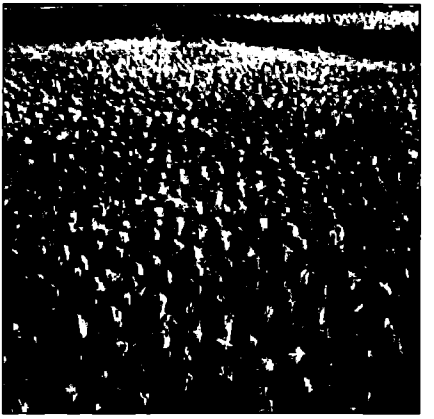

শুধুই বৃষ্টি নির্ভর জমি

সর্পের এমন নির্ভয় চলাচল -দৃশ্য সুলভ নয়

www.nagorikpathagar.com

উত্তরাঞ্চল থেকে গাধাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চিড়িয়াখানায় শেষ বংশধরেরা

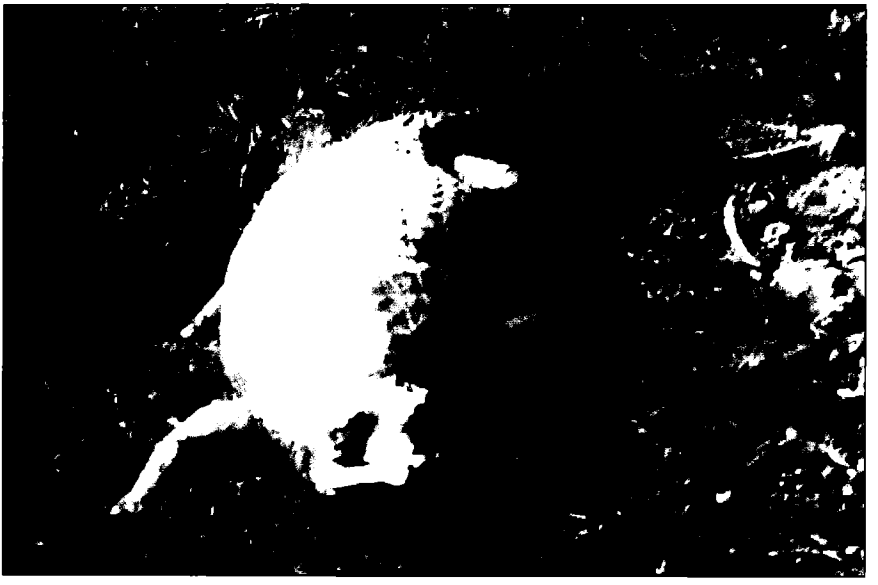

পদ্মার বিলুপ্ত ঘড়িয়াল এখন চিড়িয়াখানায় ঠাঁই পেয়েছে

www.nagorikpathagar.com

পরিবেশ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে লেখককে প্রদত্ত সংবর্ধনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর সাইদুর রহমান খান

জাতীয় পরিবেশ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে রাজশাহী সিটি প্রেসক্লাবের সংবর্ধনায় অতিথিবৃন্দ

www.nagorikpathagar.com

২০০০ সালে পরিবেশ পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পুরস্কার হাতে লেখক (ডানে)

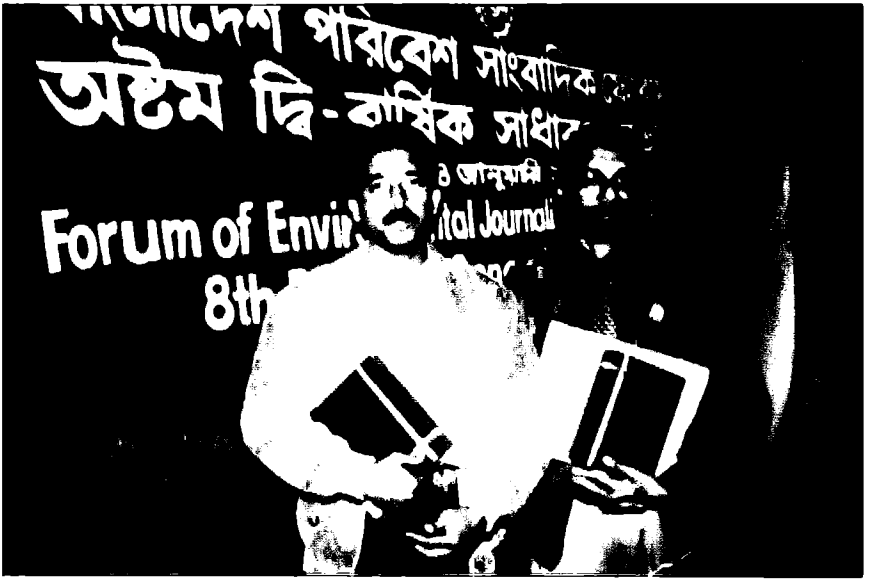

২০০০ সালে পরিবেশ পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেসক্লাবে পুরস্কার হাতে লেখক (ডানে)

www.nagorikpathagar.com

বিপন্ন প্রাণী উদ্‌বিড়াল

রাজকীয় চেহারার চিলও বিলুপ্ত হবার পথে

ঠিকানা হারাচ্ছে কচ্ছপেরা

নিশাচর পাখি পেঁচা হারিয়ে যাচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

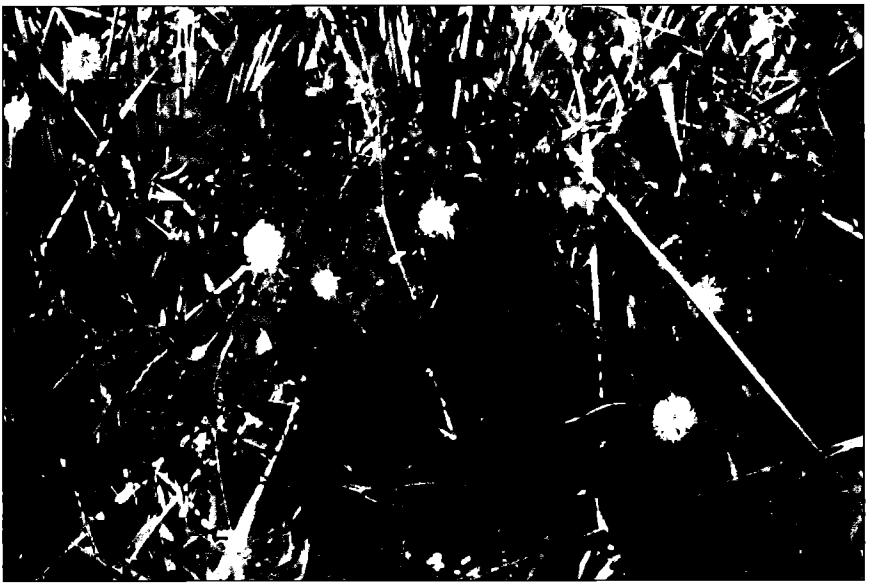

ঔষধি গুল্মলতা-ফুলের এমন দৃশ্য তেমন চোখে পড়েনা

কৃষিতে সেচের সম্প্রসারণ ঘটছে

www.nagorikpathagar.com

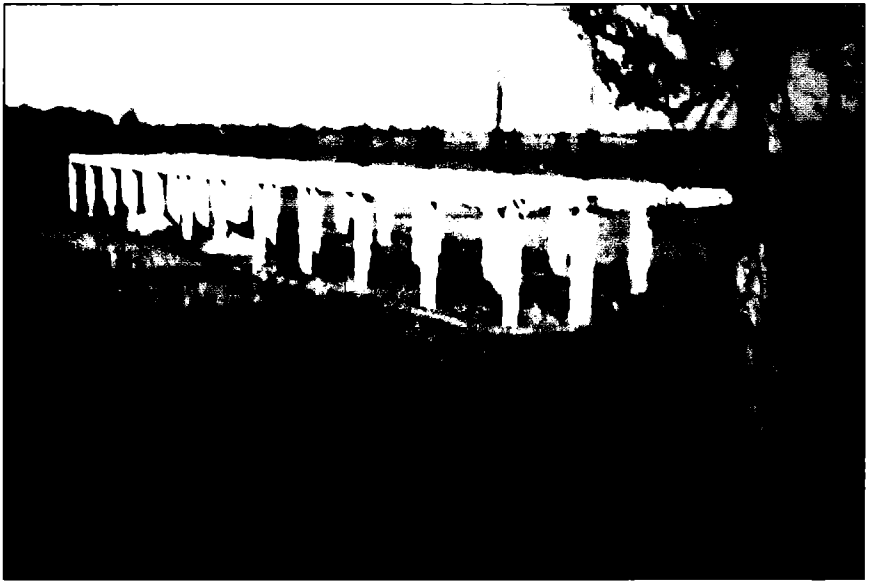

জমি খেয়েছে বিল, এই জমিও দখল করেছে কনক্রিটের ভবন

বরেন্দ্রের বহু জমি এখনও এক ফসলী

www.nagorikpathagar.com

আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় মারা গেছে পিঞ্জিরা বেগম

বিশুদ্ধ পানির জন্য প্রাণপন চেষ্টা

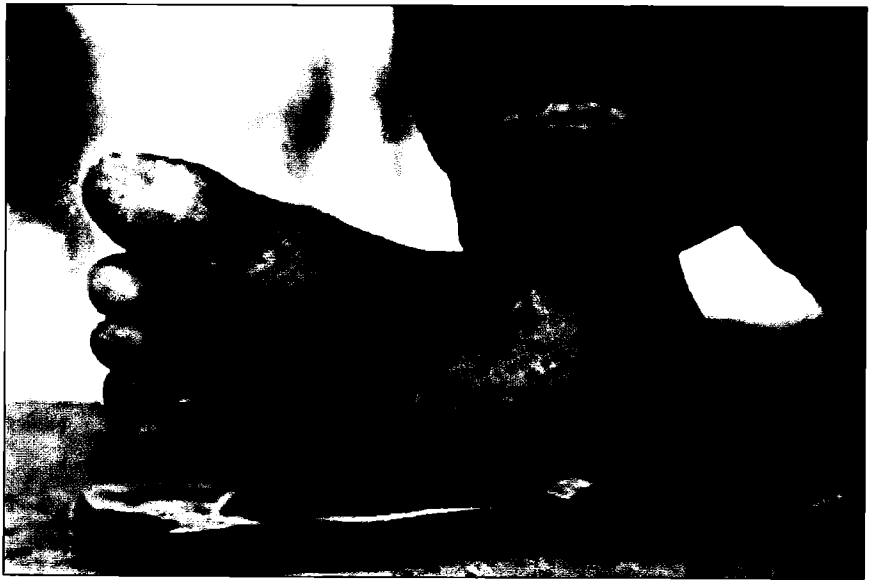

আর্সেনিক বিষ -বিক্ষত মানব দেহ

www.nagorikpathagar.com

গৃহস্থালির বর্জ নগর স্বাস্থ্যের জন্য কম হুমকি নয়

ভরাট হয়ে যাচ্ছে পুকুর- জলাশয়

www.nagorikpathagar.com

পরিলেখ